রোযার দাবি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِه •

وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهِ فَلَامُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ أَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ أَصْحَابِهِ •

وَ بَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ* بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

‘রমাযান মাস– যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা আদ্যোপান্ত হিদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং সত্য মিথ্যার মধ্যে ফয়সালা করে দেয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে সে যেন এ সময় অবশ্যই রোযা রাখে।’

বরকতের মাস

ইনশাআল্লাহ কয়েকদিন পর পবিত্র রমাযান মাস শুরু হবে। এমন কোন্ মুসলমান আছে, যে এ মাসের শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে অবগত নয়? আল্লাহ তা ‘আলা তাঁর ইবাদতের জন্যে এ মাসকে বানিয়েছেন। আল্লাহ তা ‘আলা না জানি কতো অফুরন্ত রহমত এ মাসে তাঁর বান্দাদের প্রতি অবতীর্ণ করেন! আমি–আপনি আল্লাহপ্রদত্ত এসব রহমতের কথা কল্পনাও করতে পারবো না।

এ মাসে কিছু আমল তো এমন রয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মুসলমান জানে এবং তার উপর আমলও করে। যেমন এ মাসে রোযা ফরয। আলহামদুলিল্লাহ! রোযা রাখার তাওফীকও মুসলমানদের হয়ে থাকে। তারাবীহের নামায সুন্নাত হওয়ার বিষয়টিও তারা জানে। এতে অংশগ্রহণের সৌভাগ্যও তাদের হয়ে থাকে। কিন্তু এখন আমি অন্য একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি।

সাধারণত মানুষ মনে করে যে, রমাযান মাসে দিনে রোযা রাখা এবং রাতে তারাবীহের নামায পড়াই হলো পবিত্র রমাযান মাসের বৈশিষ্ট্য। এখানেই শেষ। আর কোনো বৈশিষ্ট্য এতে নেই। এ দু’ টি ইবাদত যে, এ মাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানেই কথা শেষ নয়। প্রকৃতপক্ষে রমাযান মাস আমাদের নিকট আরও কিছু দাবি করে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা ‘আলা ইরশাদ করেন–

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

‘আমি জিন ও মানুষকে একটি কাজের জন্যেই শুধু সৃষ্টি করেছি, আর তা হচ্ছে, তারা আমার ইবাদত করবে।’

এ আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা ‘আলা মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য এই বলেছেন যে, তারা আল্লাহ তা ‘আলার ইবাদত করবে।

ইবাদতের জন্যে ফেরেশতা কি যথেষ্ট ছিলো না?

এখানে এসে কতক লোকের বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত লোকের মনে প্রশ্ন জাগে যে, মানব সৃষ্টির লক্ষ্য যদি ইবাদতই হয়ে থাকে তাহলে এ জন্যে মানব সৃষ্টির কী প্রয়োজন ছিলো? এ কাজ তো ফেরেশতারা পূর্ব থেকেই উত্তমরূপে করে আসছিলো। তারা তো আল্লাহর তাসবীহ-তাকদীসে ব্যাপৃত ছিলো। এ কারণেই তো আল্লাহ তা 'আলা যখন হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন এবং ফেরেশতাদেরকে বললেন যে, আমি এ ধরনের মানব সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। তখন ফেরেশতারা নির্দ্বিধায় বলেছিলো যে, আপনি এমন এক মানব সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন, যারা জমিনের বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। ইবাদত, তাসবীহ ও তাকদীস তো আমরা করছি। একইভাবে আজও প্রশ্নকারীরা প্রশ্ন করে থাকে যে, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য যদি শুধু ইবাদত করাই হতো, তাহলে এর জন্যে মানুষ সৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিলো না। এ কাজ তো পূর্ব থেকেই ফেরেশতারা সম্পাদন করে আসছিলেন।

এটি ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠত্ব নয়

নিঃসন্দেহে ফেরেশতারা আল্লাহ তা 'আলার ইবাদতে রতো ছিলেন। কিন্তু তাদের ইবাদত ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের। আর মানুষের দায়িত্বে যে ইবাদত দেয়া হয়েছে তার আঙ্গিক সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। কারণ, ফেরেশতারা যে, ইবাদত করছিলো তার বিপরীত করার শক্তি তাদের প্রকৃতির মধ্যেই নেই। তারা যদি ইবাদত করতে না চায়, তাহলে সে যোগ্যতাও তাদের মধ্যে নেই। আল্লাহ তা 'আলা তাদের মধ্যে গোনাহ করার যোগ্যতা দেননি। না তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, না যৌন চাহিদা আছে। গোনাহের চাহিদা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা তো দূরের কথা তাদের অন্তরে গোনাহ করার প্রবণতাও জাগে না। এ কারণে আল্লাহ তা 'আলা তাদের জন্যে পুরস্কার ও সওয়াবও ধার্য করেননি। ফেরেশতারা যদি গোনাহের কাজ না করে তবে এটা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নয়। যেহেতু তা তাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নয়, তাই জান্নাতরূপী প্রতিদান ও পুরস্কারও তাদের জন্যে নয়।

নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি দৃষ্টি না দেয়া অন্ধের পরাকাষ্ঠা নয়

উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি নেই। এ কারণে সারাজীবনে সে কখনও সিনেমা দেখেনি, টেলিভিশন দেখেনি এবং পর-নারীর প্রতিও দৃষ্টিপাত করেনি। বলুন তো! এসব গোনাহ না করায় তার কী শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে? এগুলো করার ক্ষমতাই তো তার মধ্যে নেই। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি, যার দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরিই ঠিক আছে। যে বস্তু ইচ্ছা দেখতে পারে। দেখার শক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্তরে পর-নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করার বাসনা জাগলে তৎক্ষণাৎ সে আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টি নত করে নেয়। দৃশ্যত উভয়েই গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। প্রথম ব্যক্তিও গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিও গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করছে। কিন্তু প্রথম ব্যক্তির গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নয়। হ্যাঁ, দ্বিতীয় ব্যক্তির গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা শ্রেষ্ঠত্ব।

এ ইবাদত ফেরেশতাদের সাধ্যভুক্ত নয়

তাই ফেরেশতারা যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার না করে, তবে তা কোনো ফযীলতের বিষয় নয়। কারণ, তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণাই লাগে না। তাই পানাহার না করার কারণে তাদের কোনো পুরস্কার নেই। কিন্তু

মানুষ এসব প্রয়োজন নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। তাই কোনো মানুষ যতো উচ্চ মার্গেই পৌঁছাক না কেন, এমনকি সর্বোচ্চ ধাম নবুওয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেও পানাহার থেকে অমুখাপেক্ষী হয় না। তাই কাফেররা নবীগণের উপর আপত্তি করেছে যে–

وَ قَالُوْا مَالِ ہٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ

'এবং তারা বলে– এ কেমন রাসূল যে, খাবার খায় এবং হাটে–বাজারে চলাফেরা করে?'

তাই পানাহারের চাহিদা নবীগণেরও ছিলো। কোনো মানুষের ক্ষুধা লেগেছে, কিন্তু আল্লাহর হুকুমের কারণে সে আহার করছে না, তাহলে এটা তার শ্রেষ্ঠত্ব। তাই আল্লাহ তা 'আলা ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বলেন যে, আমি এমন এক মাখলুক সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, যার মধ্যে ক্ষুধা থাকবে, তৃষ্ণা থাকবে, যৌন চাহিদা থাকবে, গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী উপাদানও থাকবে, কিন্তু যখন গোনাহের চাহিদা সৃষ্টি হবে, তখন সে আমাকে স্মরণ করবে এবং গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করবে। তার এ ইবাদত এবং গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা আমার কাছে মূল্যবান। যার পুরস্কার ও প্রতিদান দেয়ার জন্যে আমি এমন জান্নাত তৈরি করে রেখেছি, যার প্রস্থ হবে আসমান ও জমীনের সমান– عرضها السموت والأرض

কারণ, তার অন্তরে গোনাহের চাহিদা ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়, প্রবৃত্তির তাড়না সৃষ্টি হয়, উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, কিন্তু আমার ভয়ে ও আমার শ্রেষ্ঠত্বের কথা

চিন্তা করে এই মানুষ গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে। নিজের চোখকে গোনাহ থেকে হেফাজত করে। নিজের কানকে গোনাহ থেকে হেফাজত করে। নিজের জিহ্বাকে গোনাহ থেকে হেফাজত করে। গোনাহের প্রতি ধাবমান পদযুগলকে আটকিয়ে রাখে। যেন আমার আল্লাহ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন। এ ইবাদত ফেরেশতাদের সাধ্যভুক্ত নয়। এর জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে।

হযরত ইউসুফ আ.–এর ফযীলত

যোলায়খা কর্তৃক হযরত ইউসুফ আ.–এর সামনে যেই অগ্নিপরীক্ষা এসেছিলো তা কোন্ মুসলমান না জানে? কুরআনে কারীম বলে, যোলায়খা হযরত ইউসুফ আ.–কে গোনাহের আহ্বান করেছিলো। তখন যোলায়খার অন্তরেও গোনাহের চিন্তা জেগেছিলো এবং হযরত ইফসুফ আ.–এর অন্তরেও গোনাহের চিন্তা এসেছিলো। যে কারণে সাধারণ মানুষ হযরত ইউসুফ আ.–এর উপরে আপত্তি করে এবং তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করে। অথচ কুরআনে কারীম বলতে চায় যে, গোনাহের চিন্তা জাগা সত্ত্বেও আল্লাহ তা 'আলার ভয়ে এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা চিন্তা করে তিনি গোনাহের চাহিদার উপর আমল করেননি। আল্লাহ তা 'আলার হুকুমের সামনে তিনি মাথা নত করেছিলেন। কিন্তু গোনাহের চিন্তাই যদি অন্তরে না জাগতো, গোনাহের যোগ্যতাই যদি ভিতরে না থাকতো এবং গোনাহের চাহিদাই যদি সৃষ্টি না হতো তাহলে যোলায়খা যদি হাজারবারও গোনাহের আহ্বান করতো তাতে তো তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কিছু ছিলো না। ফযীলত তো এখানেই যে, গোনাহের প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে, জায়গাও নিরাপদ, পরিবেশও অনুকূল, অন্তরে ইচ্ছাও জাগছে, কিন্তু এতো কিছু সত্ত্বেও আল্লাহ তা 'আলার হুকুমের সামনে নতি স্বীকার করে তিনি বললেন–

معاذالله

'আমি আল্লাহর পানাহ চাচ্ছি।'

এই সেই ইবাদত, যার জন্যে আল্লাহ তা 'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

আমাদের জান বিক্রি হয়ে গেছে

মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যই যখন ইবাদত, তখন তার দাবি তো ছিলো, মানুষ পৃথিবীতে আগমন করার পর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইবাদত ছাড়া আর কিছু করবে না। অন্য কোনো কাজ করার অনুমতি তার থাকবে না। সুতরাং কুরআনে কারীমের অন্যত্র আল্লাহ তা 'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

'আল্লাহ তা 'আলা ঈমানদারদের থেকে তাদের জান এবং মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। তার বিনিময়ে আখেরাতে তারা জান্নাত লাভ করবে।'

আমাদের জান যখন বিক্রি হয়ে গেছে, তখন যে জান নিয়ে আমরা আছি, তা আমাদের নয়। তার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ জান যেহেতু আমাদের নয়, তাই তার দাবি ছিলো এ দেহ-প্রাণ আল্লাহর ইবাদত ছাড়া অন্য কাজে লাগানো যাবে না। তাই আল্লাহ যদি আমাদেরকে এই নির্দেশ দিতেন যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমাদের অন্য কোনো কাজের অনুমতি নেই। তোমরা শুধু সিজদায় পড়ে আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকবে। উপার্জন করারও অনুমতি নেই, পানাহারেরও অনুমতি নেই। তাহলে তো অবিচার হতো না। কারণ, সৃষ্টিই করা হয়েছে ইবাদতের জন্যে।

এমন ক্রেতার জন্যে জান কোরবান করুন!

এমন ক্রেতার জন্যে জান কোরবান করুন! আল্লাহ তা 'আলা আমাদের জান-মাল ক্রয় করে নিলেন। তার পরিপূর্ণ দাম হিসেবে জান্নাতও দিলেন। তারপর সেই জান-মাল আমাদেরকে ফিরিয়েও দিলেন। এবং আমাদেরকে এ অনুমতিও দিলেন যে, পানাহার করো, উপার্জন করো, দুনিয়ার কাজকর্মও করো। তবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ো, অমুক অমুক কাজ করা থেকে বিরত থাকো, আর অবশিষ্ট সময় যা ইচ্ছা তাই করো। এটা আল্লাহ তা 'আলার বিরাট দয়া ও মেহেরবানী।

এ মাসে আসল লক্ষ্যের দিকে ফিরে আসো

কিন্তু অন্যান্য কাজ জায়েয করার ফল কী হয়ে থাকে? আল্লাহ তা 'আলা জানতেন যে, মানুষ যখন দুনিয়ার কাজ-কারবার ও ধান্দায় মগ্ন হবে, তখন ক্রমান্বয়ে তার অন্তরে গাফলতের পর্দা পড়তে থাকবে। জাগতিক কাজ-কারবার ও বেতিব্যস্ততায় হারিয়ে যাবে। তাই এ উদাসীনতা দূর করার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে বিশেষ কিছু সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পবিত্র রমাযান মাস সেগুলোর অন্যতম। কারণ, বছরের এগারো মাস আপনি ব্যবসায়, কৃষিতে, মজদুরিতে, জাগতিক কাজ-কর্মে, পানাহারে, হাসি-তামাশায়, অন্যান্য ব্যস্ততায় মগ্ন ছিলেন। যার ফলে অন্তরে গাফলতির পর্দা পড়তে আরম্ভ করেছে। এ কারণে আল্লাহ তা 'আলা একটি মাস নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, এ মাসে তোমরা তোমাদের সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য ইবাদতের দিকে ফিরে আসো। যে উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে এবং যে লক্ষ্যে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই কাজ করো। এ মাসে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকো। এগারো মাস ধরে তোমাদের দ্বারা যেসব গোনাহ হয়েছে, সেগুলো মাফ করিয়ে নাও। তোমাদের অন্তরের যোগ্যতায় যে ক্লেদ যুক্ত হয়েছে তা পরিষ্কার করাও। অন্তরে গাফলতের যে পর্দা পড়েছে, তা দূর করাও। এ কাজের জন্যে আমি এ মাস নির্ধারণ করেছি।

‘রমাযান’ শব্দের অর্থ

‘রমাযান’ মীমে সাকিনযোগে আমরা ভুল উচ্চারণ করি। সঠিক উচ্চারণ হবে ‘রমাযান’ । মীমে যবরযোগে। রমাযান শব্দের অনেকে অনেক অর্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আরবী ভাষায় রমাযান শব্দের মূল অর্থ দাহ্যকারী। এ মাসের রমাযান নাম এ জন্যে রাখা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম যখন এ মাসের রোযা রাখা হয়, তখন সে বছর এ মাসটি অত্যন্ত উত্তপ্ত গ্রীষ্মের মধ্যে এসেছিলো। এ কারণে মানুষ এর নাম দিয়েছে ‘রমাযান’ ।

নিজের গোনাহ মাফ করাও

কিন্তু উলামায়ে কেরাম বলেন যে, এ মাসকে রমাযান এ জন্যে বলা হয় যে, এ মাসে আল্লাহ তা ‘আলা নিজ দয়া ও অনুকম্পায় বান্দার গোনাহসমূহ জ্বালিয়ে দেন। ভষ্মিভূত করে দেন। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা ‘আলা এ মাস নির্ধারণ করেছেন। এগারো মাস জাগতিক কাজ-কারবার ও পার্থিব ব্যস্ততায় মগ্ন থাকার ফলে অন্তরে গাফলত ছেয়ে গেছে। এ এগারো মাসে যে সমস্ত গোনাহ ও ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, আল্লাহ তা ‘আলার দরবারে হাযির হয়ে সেগুলো ক্ষমা করিয়ে নাও। গাফলতের পর্দা অন্তর থেকে সরিয়ে ফেলো। যেন এর মাধ্যমে জীবনের এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়ে যায়। এ কারণে কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা ‘আলা ইরশাদ করেছেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

‘হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরয করা হয়েছিলো, যাতে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।’

তোমাদের উপর রোযা এ জন্যে ফরয করা হয়েছে, যেন তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। বিধায় রমাযান মাসের আসল উদ্দেশ্য হলো, সারা বছরের গোনাহ মাফ করানো, দিল থেকে গাফলতের পর্দা সরানো এবং অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করা। যেমন কোনো মেশিন কিছুদিন ব্যবহার করার পর তা সার্ভিসিং করাতে হয়। পরিষ্কার করাতে হয়। তেমনিভাবে আল্লাহ তা ‘আলা মানুষের সার্ভিসিং ওভারহোলিং করানোর জন্যে পবিত্র রমাযান মাসের ব্যবস্থা করেছেন। যাতে এ মাসে তোমরা নিজেদেরকে পরিষ্কার করো এবং নিজেদের জীবনকে এক নতুন রূপ দাও।

এ মাসকে ফারেগ করুন

তাই শুধু রোযা রাখা আর তারাবীহ পড়ার দ্বারাই কাজ শেষ হয়ে যায় না। বরং এ মাসের দাইবনে হলো, মানুষ এ মাসে অন্যান্য কাজ থেকে নিজেকে অবসর করবে। এগারো মাস পর্যন্ত সে অন্যান্য ব্যস্ততায় নিমগ্ন ছিলো। কিন্তু এ মাস মানব সৃষ্টির আসল লক্ষ্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের মাস। তাই এ মাসের পুরো সময়, তা না হলে কমপক্ষে অধিকাংশ সময় বা যতো বেশি সময় সম্ভব আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে কাটাবে। এ জন্যে মানুষের পূর্ব-প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে পূর্ব-পরিকল্পনার।

রমাযানকে স্বাগত জানানোর সঠিক পদ্ধতি

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে একটি নতুন বিষয়ের প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। যার সূচনা হয় আরব দেশগুলোতে। বিশেষ করে মিসর ও সিরিয়াতে। পরবর্তীতে অন্যান্য দেশেও তার প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশেও তার আগমন ঘটেছে। তা হলো রমাযান আরম্ভ হওয়ার পূর্বে কিছু সভা-সম্মেলন করা হয়, যার নাম দেয়া হয় রমাযানকে স্বাগত জানানোর মাহফিল। রমাযানের এক-দু' দিন পূর্বে অনুষ্ঠিত সে মাহফিলে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত ও ওয়াজ উপদেশের ব্যবস্থা করা হয়। যার উদ্দেশ্য হয় মানুষকে এ কথা জানানো যে, আমরা রমাযান মাসকে স্বাগত জানাচ্ছি। তাকে খোশ আমদেদ জ্ঞাপন করছি। রমাযান মাসকে স্বাগত জানানোর এ আবেগ অনেক ভালো। কিন্তু এ ভালো আবেগই আরও সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কিছুদিন পর বিদআতের রূপ ধারণ করে। এই স্বাগত মাহফিলও কতক জায়গায় বিদআতের রূপ ধারণ করেছে। রমাযানুল মুবারককে স্বাগত জানানোর আসল পদ্ধতি এই যে, রমাযান মাস আসার পূর্বে নিজের সময়সূচী পরিবর্তন করে এমনভাবে সাজানোর চেষ্টা করবে, যেন অধিক থেকে অধিক সময় আল্লাহ তা 'আলার ইবাদতে ব্যয় হয়। রমাযান মাস আসার পূর্বে চিন্তা করে দেখবে যে, এ মাসে আমি নিজের ব্যস্ততাকে কি করে কমাতে পারি। কোনো ব্যক্তি যদি ইবাদতের জন্যে নিজেকে পুরোপুরি ফারেগ করতে পারে তাহলে তো খুবই ভালো। আর যদি কেউ নিজেকে পুরোপুরো অবসর করতে না পারে তাহলে চিন্তা করে দেখবে যে, কোন্ কোন্ কাজ এ মাসে বাদ দিতে পারি, সেগুলো বাদ দিবে। কোন্ কোন্ ব্যস্ততাকে কমাতে পারি, সেগুলো কমাবে। আর যে সমস্ত কাজকে রমাযানের পর পর্যন্ত পিছানো সম্ভব সেগুলোকে পিছাবে। রমাযানের অধিক থেকে অধিক সময়কে ইবাদতের মধ্যে কাটানোর চেষ্টা করবে। আমার মতে রমাযানকে স্বাগত জানানোর সঠিক পদ্ধতি এটিই। এ কাজ করলে ইনশাআল্লাহ রমাযানুল মুবারকের আসল রূহ এবং তার নূর ও বরকত লাভ হবে। অন্যথায় রমাযান আসবে এবং চলে যাবে, কিন্তু সঠিক উপায়ে আমরা তার উপকার লাভ করতে পারবো না।

রোযা ও তারাবীহ থেকে একধাপ এগিয়ে

রমাযানুল মুবারককে যখন অন্যান্য ব্যস্ততা থেকে মুক্ত করলেন, এখন এ অবসর সময় কি কাজে ব্যয় করবেন? সবাই জানে, রোযা রাখা ফরয। একইভাবে তারাবীহ সম্পর্কেও সবাই জানে যে, তা সুন্নাত। কিন্তু রমাযানের বিশেষ একটি দিকের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা এই যে-

আলহামদুলিল্লাহ! যে ব্যক্তির অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমানও রয়েছে, তার অন্তরে রমাযানুল মুবারকের ব্যাপারে এক প্রকারের শ্রদ্ধা ও পবিত্রতার অনুভূতি রয়েছে। যে কারণে সে চেষ্টা করে, পবিত্র এ মাসে বেশি পরিমাণে আল্লাহর ইবাদত করার এবং অধিক পরিমাণে নফল পড়ার। যে সব লোক অন্যান্য দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে আসতে গড়িমসি করে, তারাও তারাবীহের মতো দীর্ঘ নামাযে প্রতিদিন অংশগ্রহণ করে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ! এ সবই এ মাসের বরকত। মানুষ এ মাসে ইবাদত, নামায, যিকির ও তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে থাকে।

একটি মাস এভাবে অতিবাহিত করুন

কিন্তু এ সমস্ত নফল ইবাদত, নফল নামায, নফল যিকির ও নফল তিলাওয়াত থেকে অধিক অগ্রগণ্য আরেকটি জিনিস রয়েছে, যার দিকে মনোযোগ দেয়া হয় না। তা হলো, এ মাসকে গোনাহ থেকে পবিত্র করে অতিবাহিত করতে হবে। এ মাসে যেন আমাদের থেকে কোনো প্রকার গোনাহ না হয়। এ মুবারক মাসে যেন কু-দৃষ্টি না হয়। চোখ অপাত্রে না পড়ে। কান অন্যায় কথা না শোনে। মুখ থেকে কোনো খারাপ কথা বের না হয়।

আল্লাহ তা 'আলার যাবতীয় নাফরমানী থেকে বিরত থাকে। এ মুবারক মাস যদি এভাবে অতিবাহিত হয়, তারপর এক রাকাত নফল নামাযও না পড়েন, অধিক তিলাওয়াতও না করেন, যিকির-আযকারও না করেন, তবে গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে এবং আল্লাহর নাফরমানী না করে এ মাস অতিবাহিত করেন, তাহলে আপনি মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। এ মাস আপনার জন্যে বরকতময়। এগারো মাস পর্যন্ত সব ধরনের কাজে লিপ্ত ছিলেন। এখন আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ এক মাস আসছে। কমপক্ষে এ মাসকে তো গোনাহ থেকে মুক্ত রাখুন। কমপক্ষে এ মাসে আল্লাহর নাফরমানী করবেন না। মিথ্যা বলবেন না। গীবত করবেন না। কু-দৃষ্টিতে লিপ্ত হবেন না। এ মাসে অপাত্রে কান ব্যবহার করবেন না। ঘুষ খাবেন না। সুদ খাবেন না। কমপক্ষে একটি মাস এভাবে অতবাহিত করুন।

এটি কেমন রোযা হলো?

আপনি তো মাশআল্লাহ আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে রোযা রাখছেন। কিন্তু রোযার অর্থ কি? রোযার অর্থ হলো, আহার করা থেকে বিরত থাকা, পান করা থেকে বিরত থাকা এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পুরা করা থেকে বিরত থাকা। রোযার মধ্যে এ তিন জিনিস থেকেই বিরত থাকা জরুরী। এখন লক্ষণীয় হলো, এ তিনটি জিনিষই মৌলিকভাবে হালাল। খাওয়া হালাল, পান করা হালাল এবং বৈধভাবে স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা পুরা করাও হালাল। রোযা অবস্থায় আপনি এ হালাল জিনিষ থেকো তো বিরত থাকছেন। কিন্তু যেসব জিনিস পূর্ব থেকেই হারাম ছিলো, যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা, কৃ-দৃষ্টি দেয়া, যেগুলো সর্বাবস্থায় হারাম। রোযা অবস্থায় এ সব কিছুই করা হচ্ছে। এখন রোযাও রেখেছেন, মিথ্যাও বলছেন। রোযাও রেখেছেন, গীবতও করছেন। রোযাও রেখেছেন আবার সময় কাটানোর জন্যে নোংরা সিনেমাও দেখছেন। এটা কি ধরনের রোযা হলো যে, হালাল জিনিস তো ছাড়লেন কিন্তু হারাম ছাড়লেন না। এ কারণে হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা 'আলা বলেন- যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় মিথ্যা ছাড়লো না, তার ক্ষুৎ-পিপাসার আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

তাই যখন মিথ্যা বলা ছাড়লো না- যা পূর্ব থেকে হারাম ছিলো- তাহলে আহার ছেড়ে সে এমনকি আমল করলো?

রোযার সওয়াব নষ্ট হয়ে গেলো

যদিও মাসআলার দিক থেকে রোযা হয়ে গেছে। কোনো মুফতী ছাহেবকে এ কথা জিজ্ঞাসা করলে যে, আমি রোযাও রেখেছি, মিথ্যাও বলেছি এর হুকুম কী? তখন মুফতী ছাহেব এ উত্তরই দিবেন যে, রোযা হয়ে গেছে, এর কাযা করা জরুরী নয়। কিন্তু কাযা ওয়াজিব না হলেও ঐ রোযার সওয়াব ও বরকত বিলীন হয়ে গেছে। কারণ, আপনি ঐ রোযার প্রাণ অর্জন করেননি।

রোযার উদ্দেশ্য তাকওয়ার প্রদীপ জ্বালানো

আমি আপনাদের সামনে যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর ফরয করা হয়েছিলো। রোযা কেন ফরয করা হয়েছে, যেন তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।

অর্থাৎ, মূলত তোমাদের উপর রোযার বিধান এ জন্যে দেয়া হয়েছে, যেন তার দ্বারা তোমাদের অন্তরে তাকওয়ার প্রদীপ আলোকিত হয়। রোযার দ্বারা তাকওয়া কীভাবে লাভ হয়?

রোযা তাকওয়ার সিঁড়ি

কতিপয় আলেম বলেছেন যে, রোযার দ্বারা তাকওয়া এভাবে সৃষ্টি হয় যে, রোযা মানুষের জৈবিক ও পাশবিক শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষ ক্ষুধার্ত থাকার ফলে তার জৈবিক দাবি ও পাশবিক চাহিদা নিষ্পেষিত হয়। যার ফলে গোনাহের চাহিদা ও উত্তেজনা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

কিন্তু হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.- (আল্লাহ তা ‘আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন) বলেন যে, শুধু পাশবিক শক্তি ধ্বংস হওয়ার বিষয় নয়, বরং মূলকথা হলো, মানুষ যখন সঠিক পদ্ধতিতে রোযা রাখে, তখন তার রোযাই তাকওয়ার এক বিরাট সিঁড়ি হয়ে থাকে। কারণ, তাকওয়ার অর্থই হলো, আল্লাহ তা ‘আলার শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতিতে গোনাহ থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ, আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে দেখছেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে জওয়াব দিতে হবে। এ কথা চিন্তা করে যখন মানুষ গোনাহ ছেড়ে দেয়, সেটাই মূলত তাকওয়া। যেমন আল্লাহ তা ‘আলা ইরশাদ করেন-

وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّہٖ وَ نَہَی النَّفْسَ عَنِ الْہَوٰی

‘আর যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় পোষণ করতো এবং নিজেকে মন্দ চাহিদা হতে বিরত রাখতো, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।’

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ভয় করে, আমাকে আল্লাহর দরবারে হাযির হতে হবে, তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং এর ফলে নিজেকে প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পুরা করা হতে বিরত রাখে এর নামই ‘তাকওয়া’ ।

আমার মালিক আমাকে দেখছেন

তাই রোযা হলো তাকওয়া অর্জনের উৎকৃষ্টতম প্রশিক্ষণ, উন্নততর তারবিয়াত। যখন একজন মানুষ রোযা রাখে- সে যতো গোনাহগার, পাপী, দোষী ও অপরাধী হোক না কেন- রোযা রাখার পর প্রচন্ড গ্রীষ্মের দিনে তীব্র পিপাসার্ত অবস্থায় নির্জন কক্ষে, রুদ্ধ দ্বার, কক্ষে ফ্রিজ রয়েছে, ফ্রিজে ঠান্ডা পানিও রয়েছে, এমতাবস্থায় মানুষের মন ঠান্ডা পানি পান করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে, তখন কি সে ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা পানি বের করে পান করবে? মোটেও করবে না। অথচ সে পানি পান করলে কোনো মানুষ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না। কেউ তাকে তিরস্কার করবে না। মানুষের কাছে সে রোযাদার বলেই গণ্য হবে। সন্ধ্যার সময় মানুষের সাথে বসে আরামছে ইফতার করলে কেউ বুঝতেও পারবে না যে, সে রোযা ভেঙ্গেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে পানি পান করে না। কেন পান করে না? পানি পান না করার পিছনে এটাই একমাত্র কারণ যে, সে চিন্তা করে, যদিও কেউ আমাকে দেখছে না, কিন্তু আমার সেই মনিব, যাঁর জন্যে আমি রোযা রেখেছি, তিনি তো আমাকে দেখছেন।

আমিই তার প্রতিদান দেবো

এ কারণেই আল্লাহ তা 'আলা বলেন যে– الصوم لی وانا أجزی به

'রোযা অমার জন্যে, তাই আমি এর প্রতিদান দেবো।'

অন্যান্য আমল সম্পর্কে বলেছেন যে, কোনো আমলের দশগুণ কোনো আমলের সত্তর গুণ এবং কোনো আমলের একশ' গুণ প্রতিদান রয়েছে। এমনকি দান করার প্রতিদান সাতশ' গুণ। কিন্তু রোযা সম্পর্কে বলেছেন যে, রোযার প্রতিদান আমিই দেবো। কারণ, সে রোযা রেখেছে শুধুই আমার জন্যে। প্রচন্ড গরমের কারণে কন্ঠনালি যখন আটকে যাচ্ছিলো, পিপাসায় জিভ শুকিয়ে যাচ্ছিলো, ফ্রিজে ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা ছিলো, নির্জন জায়গা ছিলো, দেখার কেউ ছিলো না, এতদসত্ত্বেও আমার বান্দা শুধু এ জন্যেই পানি পান করেনি যে, আমার সামনে তাকে দাঁড়াতে হবে এবং জওয়াব দিতে হবে। এ ভয় ও অনুভূতি তার অন্তরে জাগ্রত ছিলো। এ অনুভূতির নামই তাকওয়া। এ অনুভূতি যার জেগেছে, তার তাকওয়াও লাভ হয়েছে। তাই রোযা তাকওয়ার একটি রূপ এবং তা অর্জনের একটি ধাপ। এ কারণে আল্লাহ তা 'আলা বলেন– আমি রোযা এজন্যে ফরয করেছি যেন তাকওয়ার বাস্তব প্রশিক্ষণ হয়।

অন্যথায় এ প্রশিক্ষণ কোর্স পূর্ণতা লাভ করবে না

তুমি যখন রোযার মাধ্যমে এ বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভ করছো, তখন তাকে আরও উন্নত করো। তাই যেভাবে রোযার মধ্যে প্রচন্ড পিপাসায় পানি পান করা থেকে বিরত ছিলে এবং আল্লাহর ভয়ে খানা খাওয়া থেকে বিরত ছিলে, তেমনিভাবে যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে, আর সেখানে আল্লাহ তা 'আলার নাফরমানীর চাহিদা সৃষ্টি হবে, তখন সেখানেও আল্লাহ তা 'আলার ভয়ে ঐ গোনাহ থেকে বিরত থাকো। এ জন্যে আমি তোমাদেরকে এক মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স করাচ্ছি। এই প্রশিক্ষণ কোর্স তখন পূর্ণতা লাভ করবে, যখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর উপর আমল করবে। অন্যথায় প্রশিক্ষণ কোর্স পূর্ণতা লাভ করবে না। আল্লাহর ভয়ে পানি পান করা থেকে তো বিরত থাকলে, কিন্তু জীবনের কর্মক্ষেত্রে গিয়ে অপাত্রে দৃষ্টি পড়ছে, কান নিষিদ্ধ কথা শুনছে, জিহ্বা মিথ্যা কথা বলছে, এভাবে তো এ কোর্স পূর্ণতা লাভ করবে না।

রোযার এয়ারকন্ডিশনার তো লাগালে কিন্তু...

চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঔষধ ব্যবহার যেমন জরুরী, কুপথ্য থেকে বেঁচে থাকাও তেমন জরুরী। আল্লাহ তা 'আলা রোযা রাখতে বলেছেন যেন তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাকওয়া তখন সৃষ্টি হবে, যখন আল্লাহ তা 'আলার নাফরমানী এবং গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ কামরাকে ঠা–া রাখার জন্যে এয়ারকন্ডিশনার লাগালেন। এয়ারকন্ডিশনারের ফল হলো তার দ্বারা পুরো কামরা শীতল হবে। এখন এয়ারকন্ডিশনার চালু করলেন, কিন্তু সাথে সাথে ঐ কামরার দরজা ও জানালাগুলো খুলে দিলেন। এদিক থেকে শীতলতা আসছে, আর ওদিক থেকে তা বের হয়ে যাচ্ছে। তাই কামরা ঠান্ডা হচ্ছে না। ঠিক একইভাবে চিন্তা করুন – একদিকে রোযার এয়ারকন্ডিশনার তো লাগালেন, অপরদিকে আল্লাহর নাফরমানীর জানালাও খুলে দিলেন। এবার বলুন– এমন রোযার দ্বারা কোনো উপকার হবে কি?

আসল উদ্দেশ্য হুকুম মেনে চলা

এমনিভাবে রোযার দ্বারা যে, পাশবিক শক্তি চুর্ণ হয়, এটা এর দ্বিতীয় পর্যায়ের উপকারিতা। রোযার আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর হুকুম পুরা করা। পুরো দ্বীনের ভিত্তিই হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের অনুসরণ করা। তিনি যখন বলবেন খাও, তখন খাওয়াই দ্বীন। আর যখন বলবেন খেয়ো না, তখন না খাওয়াই দ্বীন। আল্লাহ তা 'আলা তাঁর আনুগত্য করা ও হুকুম মেনে চলার এক বিস্ময়কর ব্যবস্থা দিয়েছেন। সারাদিন দিয়েছেন রোযা রাখার হুকুম, আর তাতে রেখেছেন অনেক প্রতিদান ও পুরস্কার। কিন্তু যেই সূর্যাস্ত হলো, সেই হুকুম হলো দ্রুত ইফতার করো। দ্রুত ইফতার করাকে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিনা কারণে ইফতার করতে বিলম্ব করা মাকরূহ ও অপছন্দনীয়। কেন অপছন্দনীয়? এ জন্যে যে, সূর্যাস্ত হলে আমার হুকুম হলো, এখন খাও। এখনও যদি না খাও এবং অভুক্ত থাকো, এ অভুক্ত থাকা আমার কাছে পছন্দনীয় নয়। কারণ, আসল কাজ হলো আমার হুকুম মেনে চলা। নিজের ইচ্ছা পুরা করা নয়।

সাধারণ অবস্থায় দুনিয়ার কোনো জিনিসের প্রতি লোভ-লালসা খুবই নিন্দনীয়। কিন্তু তিনি যদি লালসা করার নির্দেশ দেন, তখন তার মধ্যেই রয়েছে স্বাদ ও মজা। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন যে-

چوں طمع خواہد ز من سلطان دیں   خاک بہ فرق قناعت بعد ازیں

'দ্বীন-সম্রাট যখন আমার কাছে লালসা চান,

তখন অল্পে তুষ্টির মাথায় মাটি পড়ুক।'

আল্লাহ তা 'আলা যখন লালসা চাচ্ছেন, তখন অল্পে তুষ্টির মধ্যে মজা নেই। তখন তো লালসার মধ্যেই মজা। এ কারণেই দ্রুত ইফতার করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সূর্যাস্তের পূর্বে হুকুম ছিলো, একটি দানাও যদি মুখের মধ্যে চলে যায় তাহলে গোনাহও অবধারিত এবং কাফফারাও আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ ৭টার সময় সূর্যাস্ত হয়, এখন যদি কেউ ৬:৫৯ মিনিটে একটি বুটের দানা খেয়ে ফেলে, তাহলে তার কতোটুকু রোযা কম হয়েছে? শুধু একমিনিট কম হয়েছে। একমিনিটের রোযা ভাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু এই একমিনিটের কাফফারা স্বরূপ ৬০দিন রোযা রাখা ওয়াজিব। কারণ শুধু একটি বুটের দানা এবং ১মিনিটের বিষয় নয়। আসল বিষয় হলো, সে আল্লাহর হুকুম ভেঙ্গেছে। আল্লাহর হুকুম ছিলো, সূর্যাস্তের পূর্বে খাওয়া জায়েয নেই। কিন্তু সে হুকুম লঙ্ঘন করেছে। তাই এখন একমিনিটের পরিবর্তে ৬০দিন রোযা রাখতে হবে।

দ্রুত ইফতার করো

কিন্তু যেই সূর্যাস্ত হলো, সেই হুকুম হলো- এখন দ্রুত খাও। যদি বিনা কারণে বিলম্ব করে তাহলে গোনাহ হবে। কেন? কারণ, আমি হুকুম দিয়েছি খাও, এখন খাওয়া জরুরী।

সাহরীতে বিলম্ব করা উত্তম

সাহরীর ক্ষেত্রে বিধান হলো, বিলম্বে সাহরী খাওয়া উত্তম। তাড়াতাড়ি খাওয়া সুন্নাতের খেলাফ। কতক লোক রাত ১২টায় সাহরী খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এটি সুন্নাতের খেলাফ। সাহাবায়ে কেরামও শেষ সময় পর্যন্ত সাহরী খেতেন। এ কারণে যে, এটি এমন সময়, যখন আল্লাহ তা 'আলার পক্ষ থেকে খাওয়ার অনুমতিই শুধু নয়, বরং নির্দেশ রয়েছে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সময় রয়েছে খেতে থাকবো। কেননা এর মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ তা 'আলার হুকুম পালন ও আনুগত্য। এখন কেউ যদি আগেই সাহরী খেয়ে নেয়, তাহলে সে নিজের পক্ষে থেকে রোযার সময় বৃদ্ধি করলো। এ জন্যে আগে আগে সাহরী খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুরো দ্বীনের মূল কথা হলো, আল্লাহর হুকুম মেনে চলা। যখন আমি খেতে বলেছি, তখন খাওয়ার মধ্যে সওয়াব। আর যখন খেতে নিষেধ করেছি তখন না খাওয়ার মধ্যে সওয়াব। এ কারণে হযরত হকীমুল উম্মত রহ. বলতেন– যখন আল্লাহ বলছেন– খাও! আর বান্দা বলছে যে, আমি তো খাবো না বা কম খাবো, এটা বন্দেগী ও আনুগত্য হলো না। আরে ভাই! খাওয়ার মধ্যেও কিছু নেই এবং না খাওয়ার মধ্যেও কিছু নেই, সবকিছু রয়েছে তাঁর আনুগত্যের মধ্যে। তাই যখন তিনি বলছেন– খাও, তখন খাও। নিজের পক্ষ থেকে কোনো নিয়ম বানানোর প্রয়োজন নেই।

একটি মাস গোনাহ ছাড়া অতিবাহিত করুন!

তবে গুরুত্ব দেয়ার বিষয় হলো, রোযা যখন রেখেছেন, তখন নিজেকে গোনাহ থেকে বাঁচান। চোখ বাঁচান, কান বাঁচান, জিহ্বা বাঁচান। এক রমাযানে আমাদের শাইখ হযরত ডাঃ আব্দুল হাই রহ. এ কথাও বলেন যে, আমি এমন একটি কথা বলছি, যা অন্য কেউ বলবে না। তা হলো, নিজের নফস্কে এভাবে ফুসলাও। তার সাথে চুক্তি করো, গোনাহ ছাড়া একটি মাস অতিবাহিত করো। এই একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর তোমার যা মন চাইবে করবে। হযরত বলেন, আল্লাহ তা 'আলার রহমতে আশা আছে যে, এই এক মাস গোনাহ ছাড়া অতিবাহিত হলে আল্লাহ তা 'আলা নিজেই তার অন্তরে গোনাহ ছাড়ার চাহিদা সৃষ্টি করে দিবেন। কিন্তু আগে এই অঙ্গীকার করো যে, আল্লাহ পাকের খাস মাস আসছে। এটি ইবাদতের মাস। তাকওয়া সৃষ্টির মাস। এ মাসে আমি গোনাহ করবো না। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে মনে চিন্তা করে দেখবে, সে কোন্ কোন্ গোনাহে লিপ্ত আছে। তারপর সমস্ত গোনাহের ব্যাপারে অঙ্গীকার করবে– আমি এসব গোনাহে লিপ্ত হবো না। উদাহরণস্বরূপ অঙ্গীকার করবে যে, পবিত্র রমাযান মাসে নিষিদ্ধ জায়গায় দৃষ্টি দেবো না। নিষিদ্ধ কথা শুনবো না। মুখ দিয়ে নিষিদ্ধ কথা বলবো না। এটা তো কোনো কথা হলো না যে, রোযাও রাখবো আবার চোখ দিয়ে অশ্লীল দৃশ্যও দেখবো এবং তা উপভোগও করবো।

রমাযান মাসে হালাল রিযিক

আমাদের হযরত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলতেন– কমপক্ষে এ মাসে তো হালাল রিযিকের প্রতি গুরুত্বারোপ করো। যে লোকমাই আসবে তা যেন হালাল হয়। এমন যেন না হয় যে, রোযা তো রাখলে আল্লাহর জন্যে, আর ইফতার করলে হারাম জিনিস দ্বারা। সুদের টাকা দিয়ে ইফতার হচ্ছে, ঘুষের টাকা দিয়ে ইফতার হচ্ছে, হারাম আমদানি দিয়ে ইফতার হচ্ছে। এ কেমনতর রোযা হলো যে, সাহরীও হারাম, ইফতারও হারাম, আর মাঝখানে রোযা। এ জন্যে বিশেষভাবে এ মাসে হারাম রুযি থেকে বেঁচে থাকবেন। আর আল্লাহ তা 'আলার কাছে দু 'আ করবেন, হে আল্লাহ! আমি হালাল রিযিক খেতে চাই, হারাম রিযিক থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

হারাম আয় থেকে বাঁচুন!

অনেকে এমন আছে, যাদের মৌলিক উপার্জন আলহামদুলিল্লাহ হারাম নয়, হালাল। তবে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে কিছু হারাম আয়ও মিশ্রিত হয়ে যায়। এমন ব্যক্তিদের জন্যে হারাম থেকে বাঁচা কোনো কঠিন কাজ নয়। তারা কমপক্ষে এ মাসে কিছুটা যত্নবান হবেন এবং হারাম আয় থেকে বেঁচে থাকবেন।

অবাক কান্ড! এ মাসকে আল্লাহ তা 'আলা সবরের মাস বলেছেন। সহমর্মিতা ও সমবেদনার মাস বলেছেন। কিন্তু এ মাসে মানুষ সহমর্মিতার পরিবর্তে উল্টা ছাল তুলে নেয়ার চিন্তা করে। রমাযানের পবিত্র মাস আসতেই মানুষ প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য গুদামজাত করতে আরম্ভ করে। তাই কমপক্ষে এ মাসে নিজেকে অবশ্যই হারাম কাজ হতে রক্ষা করুন।

আমদানি পুরোটা হারাম হলে কী করবে

কতক মানুষ এমন আছে, যাদের আয়ের মাধ্যম পুরোটাই হারাম। যেমন, সুদভিত্তিক কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করে। তারা এ মাসে কী করবে? আমাদের হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ.- আল্লাহ তা 'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, আমীন- সবার জন্যে পথ বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, যার পুরো আমদানি হারাম তাকে আমি পরামর্শ দেই যে, সম্ভব হলে রমাযান মাসে ছুটি নিয়ে নাও। কমপক্ষে এ মাসের খরচের জন্যে জায়েয ও হালাল আয়ের ব্যবস্থা করো। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে এ মাসের খরচের জন্যে কারও থেকে ধার নাও। এ মাসে হালাল আয় থেকে খাবো, নিজের সন্তানদেরকে হালাল খাওয়াবো- এ চিন্তা করো। কমপক্ষে এতোটুকু কাজ করো।

গোনাহ থেকে বাঁচা সহজ

মোটকথা, আমি বলতে চাচ্ছি যে, মানুষ এ মাসে নফল প্রভৃতির ব্যাপারে তো খুব গুরুত্বারোপ করে। কিন্তু গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতি সে পরিমাণ গুরুত্বারোপ করে না। অথচ এ মাসে শয়তানকে বেড়ি পরানো হয়। তাকে বন্দি করা হয়। এ কারণে শয়তানের পক্ষ থেকে গোনাহের কুমন্ত্রণা দেয়া ও উদ্বুদ্ধ করার বিষয় থাকে না। এ জন্যে গোনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়।

রোযা অবস্থায় ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করুন

রোযার সাথে সম্পর্কিত তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ক্রোধ থেকে বিরত থাকা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- এটি সহমর্মিতার মাস, পরস্পরে সমবেদনার মাস, এ জন্যে ক্রোধ ও তা থেকে সংঘটিত গোনাহসমূহ- যেমনঃ ঝগড়া, মারপিট, তুই-তোকারি- এসব থেকে বাঁচার প্রতি গুরুত্বারোপ করুন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন-

و إن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إنى صائم

‘কেউ যদি তোমাদের সঙ্গে মূর্খতাসুলভ আচরণ করে এবং ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয়। তাহলে তুমি বলে দাও আমি রোযাদার।’

আমি ঝগড়া করতে প্রস্তুত নই। মুখেও না, হাতেও না। এসব থেকে বিরত থাকবেন। এগুলো হলো মৌলিক কাজ।

রমাযান মাসে অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত করুন !

মাশাআল্লাহ! সকল মুসলমানই জানে যে, এ মাসে রোযা রাখা এবং তারাবীহ পড়া জরুরী। এ মাসের সঙ্গে কুরআনে কারীমের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। রমাযান মাসে নবী কারীমর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাইল আ. এর সঙ্গে পুরো কুরআন শরীফ ‘দাওর’ করতেন। এ জন্যে যতো অধিক পরিমাণে সম্ভব এ মাসে কুরআন তিলাওয়াত করুন। তা

ছাড়া চলতে-ফিরতে উঠতে-বসতে আল্লাহর যিকির করুন। অধিকহারে سبحان الله والحمد لله ولاإله إلاالله والله اكبر, দুরুদ শরীফ ও ইস্তিগফার পাঠ করুন। যতো বেশি সম্ভব নফল নামায আদায় করুন। অন্য সময় রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সুযোগ হয় না। কিন্তু রমাযান মাসে মানুষ যেহেতু সাহরী খাওয়ার জন্যে উঠে, তাই একটু আগে উঠে সাহরীর পূর্বে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ুন। এ মাসে ‘খুশু’ -র সাথে নামায আদায়ের এবং পুরুষরা জামাতের সাথে নামায আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করুন ।

এ সব কাজ তো এ মাসে করতেই হবে। এগুলো রমাযান মাসের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এ সবের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, গোনাহ থেকে বাঁচার ফিকির করা। আল্লাহ তা ‘আলা আমাদের সকলকে এ সব বিষয়ের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন এবং পবিত্র রমাযান মাসের নূর ও বরকত দ্বারা সঠিকভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফীক নসীব করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

রমাযান ও শাওয়াল মাসের রোযার সওয়াব

এটা শাওয়াল মাস। এ মাসে ছয়টি রোযা রাখা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- ‘যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে, আল্লাহ তা ‘আলা তাকে সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব দান করেন।’

প্রত্যেক নেক কাজের সওয়াব দশগুণ দেয়ার মূলনীতির উপর সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব পাওয়ার ভিত্তি। পবিত্র রমাযানের ত্রিশ রোযা। রমাযান যদি উনত্রিশ দিনেও হয়, তবুও আল্লাহ তা ‘আলার নিকট ত্রিশ বলেই পরিগণিত হয়। কারণ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

شهرا عيد لاينقصان رمضان وذوالحجة

‘ঈদের দুই মাস কম হয় না– রমাযান ও যিলহজ।’

ঊনত্রিশা হলেও তা ত্রিশা বলে গণ্য হয়। মোটকথা, রমাযানের ত্রিশ রোযা ও শাওয়ালের ছয় রোযা, মোট ছত্রিশ রোযা। ছত্রিশকে দশ দ্বারা গুণ করলে তিনশ’ ষাট হয়। বছরে দিনও হয় তিনশ’ ষাটটি। এভাবে আল্লাহ তা ‘আলা এ ছত্রিশ রোযা রাখার বিনিময়ে সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব দান করেন। আল্লাহ তা ‘আলা প্রত্যেক নেক কাজের এভাবেই দশ গুণ সওয়াব দিয়ে থাকেন।

‘সওমে বেসালে’ র নিষেধাজ্ঞা

কতিপয় সাহাবীকে তিনি দেখলেন, তারা দুই রোযাকে মিলিয়ে ‘সওমে বেসাল’ রাখে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিষেধ করে বললেন, তোমাদের জন্য এভাবে মিলিয়ে রোযা রাখা জায়েয নেই, হারাম। কিন্তু তিনি নিজে ‘সওমে বেসাল’ রাখতেন এবং বলতেন, তোমরা নিজেদেরকে আমার সাথে তুলনা করো না। কারণ, আমার প্রভু আমাকে পানাহার করান। অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এভাবে রোযা রাখার শক্তি নেই, আমার মধ্যে আছে, এজন্য আমি রাখি। অন্যদের জন্য সহজ ও সুবিধাজনক পথ বলে দিয়েছেন যে, ইফতারের সময় খুব পানাহার করো। সারারাত খাওয়ার অনুমতি রয়েছে।

শাবানের ৩০ তারিখে নফল রোযা রাখা

শাবানের ৩০ তারিখে রোযা না রাখার নির্দেশ রয়েছে। কেউ কেউ এই ধারণার বশবর্তী হয়ে রোযা রাখে যে, হতে পারে আজ রমাযানের ১ম দিন। সম্ভাবনা আছে রোযার চাঁদ উঠেছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি। এরজন্য মানুষ সতর্কতা স্বরূপ শাবানের ৩০ তারিখে রোযা রাখে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কতা স্বরূপ শাবানের ৩০ তারিখে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। এ রোযা না রাখার হুকুম শুধুমাত্র তার জন্য, যে রমাযান মনে করে সতর্কতা হিসাবে রোযা রাখছে। কিন্তু যে ব্যক্তি সাধারণভাবে নফল রোযা রেখে আসছে, সে যদি শাবানের ৩০ তারিখেও রোযা রাখে এবং রমাযানের সম্ভাবনার কারণে সতর্কতার নিয়ত না থাকে, অন্তরে এ চিন্তা না জাগে, তাহলে তার জন্য রোযা রাখা জায়েয।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. শাবানের ৩০ তারিখে নিজে রোযা রাখতেন এবং পুরো শহরে ঘোষণা করতেন যে, আজ যেন কেউ রোযা না রাখে। কারণ, সাধারণ মানুষের ব্যাপারে আশঙ্কা ছিলো যে, তারা এ দিনে রোযা রাখলে সম্ভাব্য রমাযানের সতর্কতার চিন্তা তাদের অন্তরে জাগবে। ফলে রোযা রাখা গোনাহের কাজ হবে। এজন্য কঠোরভাবে নিষেধ করতেন।

কাযা রোযার হিসাব ও ওসিয়ত

একইভাবে রোযার উপরও জরিপ চালাবে। বালেগ হওয়ার পর থেকে কী পরিমাণ রোযা ছুটে গিয়েছে? যদি ছুটে না যেয়ে থাকে তাহলে তো খুব ভালো। আর যদি ছুটে গিয়ে থাকে তাহলে সেগুলো হিসাব করে ওসিয়তনামা লিখে রাখবে যে, আজ অমুক তারিখে আমার দায়িত্বে এতোগুলো রোযা রয়েছে। আমি সেগুলো আদায় করতে শুরু করছি। আমি জীবদ্দশায় সবগুলো রোযা আদায় করে শেষ করতে না পারলে আমার

মৃত্যুর পর আমার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে এসব রোযার ফিদইয়া আদায় করবে। এরপর যতোগুলো রোযা আদায় করবে তা ওসিয়তনামার খাতার মধ্যে লিখে রাখবে যে, এতোগুলো রোযা আদায় করেছি, আর এতোগুলো বাকী রয়েছে। যাতে করে পরিষ্কার হিসাব থাকে।

রোযার উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা

'আনফাসে ঈসা' কিতাবে এর পরে রয়েছে তওবার বর্ণনা। তওবা সংক্রান্ত অত্যন্ত উপকারী অনেকগুলো বিষয় হযরত থানভী রহ. এখানে আলোচনা করেছেন। এসব বর্ণনা আমাদের সময়োপযোগীও। কারণ এই রমাযানুল মোবারক মাস আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাস। এ মাসের সঠিক উপকার হলো, মানুষ এ মাসে তার বিগত জীবনের সমস্ত গোনাহ থেকে তওবা করবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনকে আল্লাহ তা 'আলার বিধান মোতাবেক অতিবাহিত করার সংকল্পকে নবায়ন করবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা 'আলা ইরশাদ করেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ

'হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিলো, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।'

পুরো রমাযান মাসের সাধনা-কোর্সের আসল উদ্দেশ্য নিজের অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করা। তাকওয়া সৃষ্টি করার অর্থ হলো মানুষের অন্তরে বিগত জীবনের গোনাহ থেকে তওবা করার এবং ভবিষ্যৎ জীবনে আল্লাহর বিধান মোতাবেক জীবন অতিবাহিত করার চিন্তা জাগ্রত হওয়া। তাই তওবার এই বয়ান আমাদের বর্তমান অবস্থার উপযোগী। তওবা সংক্রান্ত অনেক শাখাগত বিষয় হযরত থানভী এখানে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা 'আলা আমাদের সকলকে এগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

যাকাত ও রোযা আদায় করবে এবং ওসিয়ত করবে

একই অবস্থা রোযার ক্ষেত্রেও। এ পর্যন্ত যতো রোযা ছুটে গিয়েছে তা খাতায় লিখবে। ছুটে যাওয়া রোযার সংখ্যা নিশ্চিতভাবে মনে না থাকলে সর্তকতার সাথে অনুমান করে সংখ্যা লিখবে। তারপর সেগুলো কাযা করতে আরম্ভ করবে এবং ঐ খাতায় লিখতে থাকবে যে, আমি এতগুলো রোযা কাযা করেছি। খাতায় এই ওসিয়তও লিখে রাখবে যে, এ সময়ের মধ্যে আমার মৃত্যু হলে আমার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে অবশিষ্ট রোযাসমূহের ফিদইয়া আদায় করবে।

একইভাবে যাকাতেরও হিসাব করবে যে, বিগত বছরসমূহে আমার উপর কী পরিমাণ অনাদায়ী যাকাত ফরয রয়েছে। তা খাতায় লিখবে এবং পরিশোধ করতে আরম্ভ করেবে। পরিশোধকৃত যাকাতের পরিমাণ খাতায় লিখে রাখবে। সাথে এ ওসিয়তও লিখে রাখবে যে, এ সময়ের মধ্যে আমার মৃত্যু হলে অবশিষ্ট যাকাত আমার সম্পদ থেকে পরিশোধ করবে। এই হলো বিস্তারিত তওবার বর্ণনা।

মোটকথা, আত্মশুদ্ধির জন্যে যখন কোনো মানুষ কোনো শাইখের নিকট যায় তখন তার দ্বারা এ দু' টি কাজ করানো হয়। একটি সংক্ষিপ্ত তওবা, আরেকটি বিস্তারিত তওবা। তওবার ব্যাপারে হযরত থানভী রহ. এখানে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তা 'আলা আমাদের সকলকে এসবগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

রমযান কেন এসেছে?

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ

ইসলামের বাইরে সবদিকে একটু নজর বুলিয়ে দেখুন! যত চিন্তাকেন্দ্র আছে, সবই দ্বীন ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ ও অনুশাসন উপেক্ষা করে সম্পূর্ণরূপে মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তাকে সম্বোধন করে। অপরদিকে যত দ্বীন ধর্ম আছে, সব মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে পদদলিত করে, একমাত্র দিল ও অন্তরাত্মাকে সম্বোধন করে।

বস্তুত বিবেক ও অন্তর্জগতের আলাদা আলাদা দুটি রাজত্ব আছে, যেখানে তারা উভয়ই আলাদা আলাদা একক রাজত্ব করে। এই দুই রাজা যে শুধু এক দেশে বাস করতে পারে না তাই নয়; বরং অনেক সময়ই তাদের উভয়কে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মেরুতে অবস্থান করতে দেখা যায়।

পৃথিবীর বুকে একমাত্র ইসলাম ধর্ম বিবেক ও হৃদয়কে একসঙ্গে এমনভাবে সম্বোধন করেছে যে, তাদের উভয়ের মাঝে সামান্যতম বিরোধ ও দ্বিধা সংকোচ তৈরি হওয়ার সুযোগও রাখেনি, যা তাদেরকে প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করাতে পারে। তার পরিবর্তে বরং শুরু থেকেই তারা দুজন পরস্পরে নিজেদের সীমারেখা স্থির করে একসঙ্গে পথ চলা শুরু করে এবং চূড়ান্ত পরিণতিতে একে অপরের মধ্যে এমনভাবে দুধ-চিনির মতো মিশে যায়, যেমন সমুদ্র-যোজন এক জায়গায় গিয়ে দুই সমুদ্রকে এক ও অভিন্ন করে দেয়। যেখানে অন্তরাত্মায় আবেগ অনুভূতি ও ইশক মুহাব্বতের সঙ্গে যেমন চিন্তা-যোগ্যতা এসে যায়, তেমনি বিবেক বুদ্ধি ও আকলের মধ্যে ইশক মুহাব্বতের যোগ্যতা তৈরি হয়ে যায়।

এই সূক্ষ্ম তাৎপর্য (যা আসলে বয়ান করে বোঝাবার বিষয় নয়; অনুভব করার বিষয় তা) মাথায় রেখে; কেউ যদি কুরআনে কারীমের সেই আয়াতগুলো চিন্তা করে, যেখানে আল্লাহ 'চিন্তা ভাবনাকে' বিবেক ও বুদ্ধির পরিবর্তে হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য হিসাবে আলোচনা করেছেন, তাহলে কুরআনের এই 'ইজাযে ইলাহি' র সামনে জগতের সর্বোচ্চ মার্গের সুসাহিত্যককেও সেজদাবনত দেখতে পাবে। আল্লাহু আকবার!

সংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামী শিক্ষা ইশক ও আকলের এমন এক সুসমন্বয়ের নাম, যার একটি যদি শেষ করে দেয়া হয়, তবে তার সকল সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যাবে।

আকাইদ ও ইবাদাতকে যদি বিবেক বুদ্ধির বেষ্টনি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়া হয়, তাহলে তা যেমন আত্মপূজা ও পৌত্তলিকতার মতো অসার ও অথর্ব ধর্মের জন্ম দেয়, তেমনি বিবেক বুদ্ধিকে যদি ইলমে ওহীর পরিশুদ্ধ আকাইদ ও ইবাদাত থেকে আজাদ করে দেয়া হয়, তাহলে তা সেক্যুলার ও বস্তুবাদের মতো শুষ্ক দর্শনের জন্ম দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যেই দর্শন ও বিশ্বাস বস্তুর অন্তরালের অন্তদৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। উভয় ছুরতে ফলাফল একইবঞ্চনা। কোথাও দেহ ও শরীরের বৈধ অধিকার থেকে; কোথাও রূহ ও আত্মার আসল খোরাক থেকে।

যখন থেকে সেক্যুলারিজমের মোকাবেলার প্রয়োজনে, যুগের চিন্তাবিদ ও লেখকরা ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্বারোপ শুরু করেছেন, তখন থেকে কেউ কেউ সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে ইসলামের আকায়েদ ও ইবাদাতের বিষয়গুলো পিছনে ফেলে দিয়েছেন। বস্তুত বিষয়গুলোকে শরীয়ত যেভাবে গুরুত্বারোপ করেছে, সেভাবে তারা তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেননি। ফলে মানুষ এখন সর্বোচ্চ একটি অর্থ উপার্জনযোগ্য প্রাণীতে (ঊপড়হড়সরপ অহরসধষ) পরিণত হয়েছে। তার জীবন মরণ সবকিছুই

যেন সাড়ে তিন হাত দেহ পরিপালনকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে; যা অচিরেই মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। রূহ ও আত্মার উন্নতি ও পরিশুদ্ধি নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। অথচ এটাই মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে বৈশিষ্ট্যম-িত করে। যার ফলে সে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েও অমর হয়ে থাকে।

যারা বস্তুগত ভোগ বিলাসকে জীবনের সবকিছু মনে করে, তাদের ভেতরের জীবনটা একটু উঁকি দিয়ে দেখুন; সুখ শান্তি ও আরাম আয়েশের সকল সরঞ্জাম তাদের হাতে থাকা সত্ত্বেও, প্রকৃত সুখ শান্তি ও আরাম আয়েশ থেকে তারা কি পরিমাণ বঞ্চিত? কারণ তারা যেভাবে দুনিয়া দিয়ে নিজেদেরকে বেষ্টিত করেছে, তা হয়তো দুনিয়ার ধন সম্পদ তাদের পদতলে স্তূপ করতে পারে, কিন্তু মনকে প্রশান্তি ও প্রবোধ দেয়া এবং রূহ ও আত্মাকে পরিতৃপ্তি দান করা তার নাগাল থেকে যোজন যোজন দূরে। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবনের এ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ সর্বদা তাদেরকে অজানা এক অস্থিরতার শিকার হয়েই জীবন-কাল 'কাটিয়ে কাটিয়ে' মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়। এই অস্থিরতার আরেকটি দুঃখজনক দিক হল, যারা তাতে নিপতিত হয়, তারা নিজেরাও জানে না, তাদের এই অস্থিরতা কেন? সার্বক্ষণিক এক অজানা কষ্ট বুকে নিয়ে ফিরে এবং অস্থিরতায় জীবনের প্রতি নিরাসক্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। কিন্তু বলতে পারে না কেন তার এই অর্স্থিরতা; কেন এই নাভিশ্বাস?

মানুষ জগতের খালিক বা মালিক নয়; সে তো কোনো খালিকের মাখলূক। তার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যই কারো ইবাদত বন্দেগী করা। তার জন্মগত স্বভাব খুঁজে ফিরে এমন এক অবিনশ্বর সত্তা, যার সামনে সে মাথা নত করে আত্মিক প্রশান্তি লাভে ধন্য হবে। তাঁর বড়ত্বের সামনে নিজের দীনতা ও হীনতার মূলধন উৎসর্গ করে জীবনের পূর্ণতা লাভ করবে। বিপদ আপদে তাঁর আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করবে। জীবনের সঙ্কীর্ণ মুহূর্তে তাঁরই তাওফীক ও নির্ভরতায় ভর করে পথচলার আলো পাবে। আজকের ভোগবাদী ও বস্তুবাদী জীবন হয়তো তার দুনিয়ার সব ব্যবস্থা করতে পারে, কিন্তু তার রূহ ও আত্মার এই স্বভাবজাত খোরাক ও চাহিদা নিবারণের ন্যূনতম কোনো ব্যবস্থা সেখানে নেই। নফস ও খাহেশের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে কখনো এই স্বভাব-চাহিদা হয়তো সুপ্ত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু কখনো তা বিলুপ্ত হবার নয়। এই সুপ্ত স্বভাব-চাহিদাই তখন সক্রিয় কিংবা নিষ্ক্রিয় কোনো অবস্থায়ই সুখ শান্তির সকল সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও তাকে একটি স্বস্তির শ্বাস গ্রহণ করতে দেয় না। তার জীবনকে বিসাদময় করে তুলে।

یوں زندگي گزار رھا ھو ں ترے بغیر جیسے کوئ گناہ کیے جا رھا ھوں میں

যেভাবে তোমাকে ছাড়া জীবন কাটাচ্ছি, তাতে যেন অবিরত কোনো পাপ করেই চলেছি।

ইসলামে ইবাদত এজন্যই রাখা হয়েছে যে, কেউ যদি ঠিক মতো ইবাদত বন্দেগী করে, তাহলে তা তার রূহের গেযা ও আত্মার খোরাক সরবরাহ করবে। পাশাপাশি তার খালিক ও মালিকআল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক মজবুত ও সুদৃঢ় করবে।

এভাবে শরীর ও আত্মার চাহিদা পূর্ণ করার মাধ্যমে মানুষ 'নুকতায়ে ই 'তেদাল' তথা মধ্যপন্থা ও পরিমিতিবোধের এমন এক কেন্দ্রবিন্দুতে উন্নিত হয়, যা মূলত 'সুকূনে ক্বালব' ও সুখ শান্তির অপর নাম। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে

اَ لَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُ

'মনে রেখ! আল্লাহর যিকিরেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।'

প্রতি বছর রমযান মাস আসার কারণ হল, বান্দা দীর্ঘ এগার মাস দুনিয়াবী কাজকর্মে এতই ব্যস্ত থাকে যে, দুনিয়াই যেন তার সকল কর্মকা–ের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বান্দা ও তার ইবাদত বন্দেগীর মাঝে একটা গাফলতের পর্দা পড়ে যায়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খুব সামান্য সময়ই তার খালেস ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত হয়। ফলে আত্মিক সফরে সে দৈহিক সফরের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে। তখন রমযান মাস দেয়া হয়, যাতে সে শারীরের গেযা কমিয়ে রুহের গেযা বাড়িয়ে, রুহানী সফরকে গতিশীল করতে পারে এবং পুনরায় সেই 'নুকতায়ে ইতিদাল' -এ উন্নিত হতে পারে; যা তার জীবনের অনেক বড় নেয়ামত। ভালো করে চিন্তা করলে বুঝবেন, এই অবস্থানে উন্নিত হওয়ার খুশি উদযাপনের জন্যই দেয়া হয়েছে ঈদুল ফিত্রের উৎসব।

সুতরাং রমযান শুধু রোযা ও তারাবীর নামই নয়; রোযা রেখে তারাবী পড়লেই রমযানের হক আদায় হয় না। রমযান মাস থেকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার জন্য প্রয়োজন অধিক থেকে অধিকতর নফল কাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করা এবং কারো হক নষ্ট না করে যথাসম্ভব নিজের সময়গুলো দুনিয়াবী কাজকর্ম থেকে ফারেগ করে নফল ইবাদত বন্দেগীতে কাটানোর চেষ্টা করা।

অন্যের হক নষ্ট না করার কথা এজন্য বলছি যে, কেউ যদি কোথাও চাকুরিরত হয়, তাহলে তার দায়িত্ব আদায় না করে নফল ইবাদত বেন্দেগীতে রত হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয।

আসলে কারো হক নষ্ট না করেও ইচ্ছা করলে সবাই-ই তার দুনিয়াবী কাজ কর্ম কিছু না কিছু কমিয়ে আনতে পারে। কিছু কাজ এমন আছে যা হয়তো জরুরি নয়; অথবা তা পিছিয়ে দেয়া যায়। এভাবে গুরুত্ব দিয়ে অন্যান্য কাজগুলো আগ-পিছ করে, রমযানের সময়কে অধিক পরিমাণে ইবাদত বন্দেগীতে কাটানো চাই।

এছাড়া যে কথাটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, রমযানে যখন মানুষ রোযা রাখে, তখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্যান্য সময় যেই পানাহার ও স্ত্রী-সম্ভোগ হালাল ছিল, তা পরিহার করে। তো এটা কেমন ইনসাফের কথা যে, বান্দা রোযার দাবিতে অন্য সময়ের হালাল বিষয়গুলো তো কষ্ট করে বর্জন করছে, কিন্তু যেই কাজগুলো সবসময়ই হারাম, সেগুলো সে অবলীলায় করে যাচ্ছে?! হালাল পানাহার বর্জন করে রোযা রাখছে, কিন্তু হারাম গীবত, শেকায়েত ও মিথ্যা ইত্যাদি ছাড়তে পারছে না। মনে রাখতে হবে, এগুলো যদি না-ই ছাড়তে পারে, তবে এই রোযায় তার রুহানী তারাক্কী ও উন্নতি কখনো সাধিত হবে না।

সুতরাং রমযান মাসে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে চোখ, যবান ও কানসহ শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গোনাহ থেকে মুক্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। একটি কদমও যেন আল্লাহর নাফরমানিতে অগ্রসর না হয় এভাবে নিজেকে অভ্যস্ত করে গড়ে তুলতে হবে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানকে সহমর্মিতার মাস সাব্যস্ত করেছেন।

হাদীসের শব্দ নিম্নরূপ:

وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ ، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ

এ মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বেশি বেশি দান সদকা করতেন। আমাদেরও এ মাসে দান সদকা, অন্যের সাহায্য সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বেশি বেশি করা উচিত।

এটি সমঝোতা ও পবিত্রতার মাস। তাই এ মাসে ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকার জন্য বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে 'কেউ যদি তোমার সঙ্গে লড়াই করতে আসে, তুমি বলে দাও আমি রোযাদার।'

খোলাসা কথা হল, রমযান শুধু সাহরী ও ইফতারের নাম নয়; রমযান একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ কোর্স, যেই প্রশিক্ষণ সকল মুসলমানকে গ্রহণ করতে হয়। উদ্দেশ্য আল্লাহর সঙ্গে যেন তার সম্পর্ক মজবুত সুদৃঢ় হয়। সব বিষয়ে আল্লাহমুখী হওয়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে। রিয়াযত মুজাহাদার মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তিকে পদদলিত করে নিজের মধ্যে উন্নত ও প্রশংসনীয় গুণাবলী তৈরি করা যায়। নেক কাজের আগ্রহ উদ্দীপনা বাড়ে এবং গোনাহের প্রতি ঘৃণা ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার স্পৃহা তৈরি হয়। অন্তরে খোদাভীতি ও পরকাল-চিন্তার আলো প্রোজ্বলিত হয়, যা তাকে রাতের আঁধারে কিংবা বিরাণ মুরুর নির্জনতায়ও অন্যায় কর্ম থেকে হেফাজত করবে। এর নামই তাক্বওয়া। এজন্যই কুরআনে কারীম এটাকে রমযানের আসল মাকসাদ সাব্যস্ত করে বলছে

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ

"হে ঈমানদারেরা! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার।"

যে ব্যক্তি তাক্বওয়ার এই তারবিয়ত ও প্রশিক্ষণ যথাযথ গ্রহণ করবে, তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ শুনিয়েছেন "যে ব্যক্তি নিরাপদে রমযান অতিবাহিত করবে, পুর্ণ বছর তার নিরাপদে অতিবাহিত হবে।"

বোঝা গেল, রমযান আমাদের পূর্ণ বছরের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য এসেছে। তবে শর্ত হল আমাদেরকে নিরাপত্তাপ্রত্যাশী হতে হবে এবং এ উদ্দেশ্যে মাসটির যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

সূত্র : যিকর ও ফিকীর: পৃ. ৩০

২রা রমযান, ১৪১৪ হিজরী, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪ ঈসায়ী

রমযান কিভাবে কাটাব?

اَ لْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَ عَلٰى اٰلِه و

أَصْحَابِه

أَجْمَعِيْنَ •

أَمَّا بَعْدُ .

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۝ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহর মেহেরবানীতে এই মুহূর্তে আমাদের এই মজলিসে এমনসব উলামায়ে কেরাম আছেন, যাঁদের সামনে যবান খোলাই দুঃসাহস মনে হয়। আমি যা বলব, সব মূলত এই সকল বুযুর্গেরই দু 'আ ও ফয়েজ বরকতের নতীজা। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক সহীহ কথা বলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমাদের এই মজলিসের সারকথা

আজকের মজলিসটি এমন সময় হতে যাচ্ছে, যার এক দুই দিন পরই রমযানের বরকতময় মাস আরম্ভ হতে যাচ্ছে। আগের দুটি মজলিসে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আমাদের এখানে একত্র হওয়ার উদ্দেশ্য হল, সকাল থেকে সন্ধ্যা; সন্ধ্যা থেকে সকাল এবং রান্নাঘর থেকে বাইতুলখালা পর্যন্ত আমরা যে বস্তুবাদী ভোগ বিলাসের চিন্তা নিয়ে দৌড় ঝাঁপ করছি, তা থেকে কিছু সময় ছিনিয়ে আখেরাতের ফিকিরে খরচ করার চেষ্টা করা। মৃত্যুর পর কোথায় যেতে হবে? সেখানে কি হবে? সেখানকার জন্য আমার কি প্রস্তুতি আছে? এসব বিষয় নিয়ে একটু ফিকির ও পরস্পর আলোচনা করা। এটাই হল আমাদের এই মজলিসের সারকথা এবং শেষ কথা। রমযান মাস এ উদ্দেশ্য সাধনে একটি লক্ষভেদী তীর, যা খোদ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের জন্য নির্বাচিত করেছেন। এই মাসটি যেভাবে কাটানো দরকার; সেভাবে যদি কাটাতে পারি, তাহলে ইসলাহ ও আত্মসংশোধনের পথে আমাদের উঠতি কদম দৌড়াতে আরম্ভ করবে ইনশাআল্লাহ।

রমযান মাস ইসলাহ ও তাযকিয়ার জন্য

রমযান সম্পর্কে সাধরণত এতটুকু ধারণাই রাখা হয় যে, দিনে রোযা রাখতে হবে এবং রাতে তারাবী পড়তে হবে। কিন্তু বস্তুত এই মাসের তাৎপর্য এর চেয়ে আরো অনেক বেশি ও সুদূরপ্রসারী। আল্লাহ তা 'য়ালা মূলত এই মাসটি মানুষের বার্ষিক ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধির জন্য নির্বাচিত করেছেন। যেমন কোনো মেশিন বা গাড়ি; কিছুদিন চলার পর তাতে ময়লা আবর্জনা জমে যায়, তখন তা সার্ভিসিং করাতে হয়। ঠিক তেমনি আমাদের জীবনের মেশিনটাও চলতে চলতে এক সময় ময়লা হয়ে যায়; ঝং পড়ে যায়। এজন্য আল্লাহ রমযান মাস দান করেছেন, যাতে তাঁর বিশেষ রহমতের পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে জীবনটা পবিত্র করে নিতে পারি।

একটি মাস দিচ্ছি তোমাদের

এ অবস্থায় আমরা এগারটি মাস অতিবাহিত করে দিয়েছি। আমাদের দিল দেমাগ ও মন মানসিকতা আল্লাহর চেয়ে আর কে বেশি বোঝেন? তিনি দেখেছেন, বান্দা এই অবস্থায় এগারটি মাস অতিবাহিত করার পর কখনো তার জামা 'আতে ত্রুটি হচ্ছে, কখনো নামাযে ত্রুটি হচ্ছে। ফলে রুহানী তারাক্কী বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং বস্তুবাদী ধ্যান ধারণা তৈরি হচ্ছে। এই সমস্যার চিকিৎসার জন্য আল্লাহ একমাস সময় দেন আমাদের। এখানে তোমার যে রুহানী অবনতি হয়েছিল এবং বস্তুবাদের সঙ্গে যে সখ্যতা গড়ে উঠতে যাচ্ছিল, তার ক্ষতিপূরণ করে নাও। অন্তরের ঝং দূর করে নাও। অন্যান্য ব্যস্ততা কমিয়ে সরাসরি ও প্রথম স্তরের ইবাদতের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ কর। একমাস এভাবে অতিবাহিত করলে, বাকি মাসগুলো আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে অতিবাহিত করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সুতরাং অন্তত এই মাসের জন্য সারা দিনের কাজের রুটিন করে নিন। আল্লাহ তা 'য়ালা ইরশাদ করেন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

“হে ঈমানদারেরা! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।”

বস্তুত পানাহার থেকে বিরত থাকাই আসল উদ্দেশ্য নয়; আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা। বিশেষ ফযীলতের এই মাসটি দেয়া হয়েছে; বান্দা যেন প্রথম স্তরের ইবাদত বন্দেগীতে অধিক থেকে অধিকতর সময় ব্যয় করে বিগত বছরের ক্ষতিপূরণ ও আগত বছর সঠিকভাবে জীবন যাপনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারে। সুতরাং রমযান আসার আগেই এমনভাবে চব্বিশ ঘন্টার রুটিন করে নেয়া উচিৎ, যেখানে দুনিয়ার একান্ত প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ন্যূনতম সময় রেখে পুরো সময়ই ইবাদত বন্দেগীর জন্য রাখা হবে। যাতে রুহানী তারাক্কী ও আত্মিক উন্নতির স্তরগুলো বেশি পরিমাণে অতিক্রম করা যায়।

রমযান মাসের অভ্যর্থনার সঠিক পদ্ধতি

ইদানিং ‘ইস্তিকবালে রমাযান’ ‘রমযানের অভ্যর্থনা’ পরিভাষাটি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করছে। যা আমি আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে মিসরে শুনেছিলাম। ঘটনাক্রমে শা’ বান মাসের শেষদিকে আমি সেখানে ছিলাম। দেখলাম খুব আলিশান ও সাড়ম্বর অনুষ্ঠান হচ্ছে। জানতে পারলাম প্রতি বছর ‘রমযানের অভ্যর্থনা’ শিরোনামে এমন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে হামদ না ‘ত বক্তৃতা ইত্যাদি চলতে থাকে। আল্লাহই জানেন, কখন আবার এই রমযানের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান বিদ ‘আতের রূপ ধারণ করে। আসলে রমযানকে অভ্যর্থনা জানানোর সঠিক পদ্ধতি নিম্নরূপ:

হযরত সালমান রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের মাত্র একদিন আগে সাহাবায়ে কেরামকে জমায়েত করে নিম্নোক্ত আলোচনা করলেন।

“হে মুসলমানেরা! তোমাদের উপর অনেক মর্যাদা ও বরকতপূর্ণ একটি মাস ছায়া বিস্তার করতে যাচ্ছে। এই মাসে একটি ফরয আদায় করলে, সত্তরটি ফরয আদায়ের সমপরিমাণ এবং একটি নফল আদায় করলে, একটি ফরযের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে।”

এভাবে যদি আমরা রমযানকে অভ্যর্থনা জানাই যে, কি করে এই মাসটি অধিক থেকে অধিকতর ইবাদত বন্দেগীতে কাটানো যায়, তাহলে তা-ই হবে প্রকৃত অর্থে রমযানের অভ্যর্থনা ও প্রশংসনীয় কাজ।

নিজের ব্যস্ততা ও কাজকর্মের অবস্থা অনুসন্ধান করুন

আমার মুহতারাম আব্বাজান হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. বলতেন, রমযানের আগে আগে নিজের কাজকর্মের অনুসন্ধান করে দেখুন, কোন কোন কাজ বন্ধ রাখা যায়। সেগুলো বন্ধ রেখে প্রথম স্তরের ইবাদত বন্দেগীতে সময় কাটান। ফরয নামায রোযা ব্যতীত অন্যান্য সময় যেসব নফল আমলের সুযোগ পাওয়া যায় না, অন্তত রমযানে সেগুলো বেশি বেশি করুন। তাহাজ্জুদের প্রতি গুরুত্ব দিন। কারণ তাহাজ্জুদ এমন এক নেয়ামত, যার মজা একমাত্র সেই বুঝেছে, যে এই নেয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন করেছে। তাহাজ্জুদের স্বাদ তো হযরত আব্দুল কাদের জিলানি রহ.-এর মতো ব্যক্তিরা পেয়েছেন।

গভীর রাতের রাজত্ব

হযরত শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানি রহ.-এর যুগে এক নবাব ছিলেন। যার ছোট্ট একটি রাজত্ব ছিল 'নিমরোয' নামে। তিনি হযরতের মুহাব্বত ও ভালোবাসায় আবেগ আপ্লুত হয়ে পুরো রাজত্ব ও জমিদারি তাঁর খেদমতে পেশ করলেন। তখন হযরত তার এই উপঢৌকনের প্রতিউত্তরে একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। যার অর্থ নিম্নরূপ "যেদিন থেকে আল্লাহ আমাকে 'নিমশব' (গভীর রাত)-এর রাজত্ব দান করেছেন, সেদিন থেকে আমি তোমার 'নিমরোযের' রাজত্ব কানা পয়সায় কিনতেও রাজি নই।"

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর বাণী

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, রাতের নামাযে আল্লাহ আমাদেরকে যেই স্বাদ ও আত্মতৃপ্তি দান করেছেন, দুনিয়ার রাজা বাদশাহরা যদি টের পেত, তাহলে তরবারি নিয়ে তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং তা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ

তাহাজ্জুদ সেই নামায, যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন আদায় করেছেন। রাতভর নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন; পা মুবারাক ফুলে গেছে; আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি. এই অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার তো পূর্বাপর সব গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তবুও এত কষ্ট করছেন কেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিচ্ছেন

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

'আমি কি তাহলে তাঁর শুকরগোযার বান্দা হব না?'

সারা বছর তাহাজ্জুদ আদায়ের সুযোগ হয়ে ওঠে না। অন্তত রমযানের সুযোগটা কাজে লাগিয়ে এই মহান ইবাদতটি আঞ্জাম দেয়ার চেষ্টা করুন। সাহরী খাওয়ার জন্য তো সবাই-ই উঠি। কষ্ট করে একটু আগে উঠে আল্লাহর সামনে দুই চার রাকাত তাহাজ্জুদের নযরানা পেশ করুন। পাকা সংকল্প করুন, পুরো রমযান মাস; এশরাক, চাশত ও আউয়াবিনসহ কোনো নফল আমলই ছাড়ব না ইনশাআল্লাহ।

অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করুন

দ্বিতীয় কথা হল, রমযান মাসের সঙ্গে কুরআনে কারীমের একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। কুরআন নাযিল করার জন্য আল্লাহ এই মাসটি নির্বাচন করেছেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল আ.-এর সঙ্গে প্রতি রমযানে কুরআনে কারীমের দাওর করতেন।

এজন্য যতদূর সম্ভব, এ মাসে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা চাই। ইমাম আ 'জম হযরত আবু হানীফা রহ. দৈনিক দুই খতম করে এক রমযান মাসেই ষাট খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আমাদের নিকট-অতীতে, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ.-এর জীবনীতে পাওয়া যায়, তাঁর দৈনিক এক খতম কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস ছিল। যদিও দৈনিক এক খতম তিলাওয়াত করা জরুরি নয়, কিন্তু আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু পারি, ততটুকু তো অন্তত চেষ্টা করা উচিত। তাছাড়া এই মাসে ইস্তেগফার, তিন

তাসবীহ ও দরূদ শরীফ ইত্যাদির অজীফা আদায়ের প্রতিও গুরুত্বারোপ করা উচিত, যাতে উঠা বসা, চলা ফেরাসবসময় যবানে যিকির জারি রাখার অভ্যাস হয়ে যায়।

এই মাসে গোনাহ থেকে বাঁচুন

বস্তুত রমযান মাস এমনভাবে অতিবাহিত করা চাই, যেন তাতে একটি গোনাহও আমার দ্বারা সংঘটিত না হয়। আমার হাত পা, চোখ কান, যবান সবকিছু গোনাহমুক্ত রাখব। আমার চোখ এ মাসে কোনো অন্যায় দৃষ্টি দিবে না; যবান কোনো অন্যায় কথা বলবে না; কান কোনো গোনাহের কথা শুনবে না। এই সংকল্প নিয়ে চললেই রোযার উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভবপর হবে। অন্যথায় এটা তো বড় হাস্যকর কথা যে, রোযা রেখে যেই পানাহার হালাল ছিল, তা বর্জন করলাম, কিন্তু যেই গীবত, শেকায়েত, বদনজর, মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা অন্য সময়ও হারাম ছিল, তা ঠিকই করলাম! হালাল ছাড়লাম; কিন্তু হারাম ছাড়লাম না। এমন রোযায় রূহানিয়াত ও রহমত বরকত কোত্থেকে আসবে?

রমযানে গোনাহ থেকে বাঁচা সহজ

প্রথমদিন থেকে সংকল্প করি, রমযানে একটি গোনাহের কাছেও যাব না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ এই মাসে গোনাহ থেকে বাঁচা সহজও করে দিয়েছেন। কারণ এমাসে শয়তানকে বন্দী করে রাখা হয়; ফলে শয়তানের কুমন্ত্রণার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

তখন বান্দাকে গোনাহে উৎসাহিত করার শয়তানী আক্রমণ হয় না; হলে নফসের কিছু আক্রমণ হয়। রমযানের আগে গোনাহে উৎসাহিত করার দুটি বস্তু থাকে; নফস ও শয়তান। রমযানে শয়তানের কার্যক্রম আল্লাহ বন্ধ করে দেন; শুধু নফসের ভূমিকা বহাল থাকে। ফলে দুই দুশমনের পরিবর্তে এক দুশমনের মোকাবেলা করে গোনাহ থেকে বাঁচাও সহজ হয়ে যায়।

হালাল রিযিকের প্রতি গুরুত্ব দিন

এই বরকতময় মাসে হালাল রিযিকের প্রতিও বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা চাই। একটি হারাম দানাও যেন আমার পেটে প্রবেশ না করে। কারণ সারাদিন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উপবাস করলাম, আর হারাম দিয়ে ইফতার করালাম; এতো লজ্জাজনক বিষয়। আস্তাগফিরুল্লাহাল আজীম।

হযরত থানভী রহ. বলেছেন, কারো আয়-রোযগার যদি হারাম হয় এবং হঠাৎ করে সে তা পরিবর্তন করতে না পারে, তাহলে অন্তত এতটুকু যেন সংকল্প করে যে, রমযান মাসে আমি হারাম ভক্ষণ করব না। বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না করতে পারলে কোথাও থেকে ঋণ নিয়ে রমযানের খোরাকির ব্যবস্থা করবে। অন্তত রমযানে যেই লোকমাটা আমার পেটে যাবে, তা যেন হারাম না হয়। এভাবে রমযান কাটাবার তাওফীক হলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ হল

وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ

‘যার রমযান নিরাপদ থাকল, তার পুরো বছর নিরাপদ থাকবে।’

আল্লাহ পাক তো বান্দাকে ক্ষমা করার জন্য বাহানা ঠিক করেই রেখেছেন। ইরশাদ হচ্ছে

• مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

'যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখবে, তার অতীতের গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে

• مَنْ قَامَ رَمَضَان إِيمَانًا وَّاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

'যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় রাত জেগে তারাবী পড়বে, তার অতীতের গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।'

এমনিভাবে যে ব্যক্তি শবে কদরের রাত জেগে ইবাদত করবে, তারও অতীত জীবনের গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। মোটকথা, রমযান মাসের কদমে কদমে আল্লাহ ক্ষমা করার ওয়াদা করে রেখেছেন।

প্রত্যেক আমলেই তাঁর সুসংবাদের আশা করুন

সুতরাং প্রত্যেক আমলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই সুসংবাদ দিয়েছেন, তা চিন্তা করে এবং তার আশা রেখে আমল করুন। তাহলে দিলে ঐ আমলের যথাযথ স্বাদ ও লয্যত অনুভূত হবে। যেমন অজু করার সময় চিন্তা করুন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন বান্দা অজু করার জন্য হাত ধৌত করে, পানির সঙ্গে তার হাতের সব গোনাহ ঝরে পড়ে।

সুতরাং নিশ্চয় পানির সঙ্গে আমার গোনাহগুলো ঝরে পড়ছে। হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, যদি অজুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়, তাহলে হাত ধোয়ার সময় চিন্তা করবে, আমার হাতের গোনাহগুলো ঝরে পড়ছে। চেহারা ধোয়ার সময় চিন্তা করবে, আমার চেহারার গোনাহগুলো ঝরে পড়ছে। যত গভীরভাবে চিন্তা করবে, ইবাদতে ততই একাগ্রতা ও গভীরতা সৃষ্টি হবে এবং ততই স্বাদ ও মজা অনুভূত হবে। রোযা রাখার সময় মাথায় রাখবে, এই রোযা আমার মাগফিরাতের কারণ হবে। তারাবী পড়ার সময় চিন্তা করবে, এই তারাবী আমার মাগফিরাতের কারণ হবে। তাহলে দেখবে, ইবাদতের স্বাদ, একাগ্রতা ও খুশূ খুজূ কিভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে?

তারাবী আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম

তারাবী সম্পর্কে হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর অত্যন্ত চমৎকার একটি কথা মনে পড়ল। যে কথায় তারাবীর আট রাকাত বিশ রাকাতের বিবাদও খুব সুন্দরভাবে সমাধান হয়ে যায়। তিনি বলতেন, এই তারাবী বড় আশ্চর্য বিষয়, যার মাধ্যমে বান্দা দৈনিক আল্লাহর নৈকট্যের অনেকগুলো স্তর পার করতে পারে। যা রমযান ব্যতীত অন্য কোনো সময় হয় না। প্রতিদিন তারাবীর বিশ রাকাত নামাযে চল্লিশটি করে সেজদা দিতে হয়। সেজদা এমন এক বিষয়, যার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা সেজদারত অবস্থায় আল্লাহর যত নিকটে থাকে, অন্য কোনোভাবে এত নিকটে পৌঁছতে পারে না।

এজন্য বর্ণিত হয়েছে:

الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ المُؤْمِنِ

'নামায মুমিনের মে' রাজ।'

মে' রাজ বলা হয় উচ্চতাকে। বান্দার মাথা সেজদাবনত হওয়ার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্যের এত উচ্চ মাকামে পৌঁছে, যা অন্য কোনোভাবে সম্ভব হয় না। হযরত মাজযূব রহ. বলেন

اگر سجدے میں سر رکھ دو زمین کو آسماں کر دو

সেজদায় যখন জমিনে মাথা রাখ, তখন তো তুমি সবার উর্ধ্বে চলে যাও এবং সব তোমার নিচে পড়ে যায়। কতই না সুন্দর বলেছেন আল্লাহ সূরা ইক্বরার শেষ দিকে

وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ ۩

সেজদা কর এবং আমার নিকটর্বর্তী হও।

(এটি সিজদার আয়াত, পাঠ করলে বা শুনলে সিজদা করতে হবে।)

সেজদা করে আমার যে নৈকট্য অর্জন করবে, তা অন্য কোনোভাবে হবে না। এই সেজদা হয়তো সারা বছরই হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ চান, বান্দা রমযানের বরকতময় সময়ে আরো বেশি সেজদা করে তাঁর নৈকট্য অর্জন করুক। এজন্য রমযানে অতিরিক্ত বিশ রাকাত তারাবীর বিধান দিলেন। সুতরাং তারাবীকে শুধু নামায মনে করো না; তারাবীর এক একটি সেজদা তোমাকে আল্লাহর আরো নিকটবর্তী করে দেয়ার অন্যতম মাধ্যম। এই সুযোগ অন্য কোনো সময় পাওয়া যাবে না। এই চিন্তা করে তারাবী পড়ে দেখুন, কত স্বাদ ও আত্মতৃপ্তি অনুভূত হয় এই তারাবীতে।

দুই রাকাত সালাতুল হাজত পড়ে নিন

আমার মুহতারাম আব্বাজান হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. রমযানের চাঁদ দেখলে বলতেন, দুই রাকাত সালাতুল হাজত পড়ে নাও। সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহর নিকট দু 'আ করহে আল্লাহ! রহমত বরকতের মাস সমাগত। এই মাস দেয়া হয়েছে বান্দা যেন তার গোনাহ থেকে পাক পবিত্র হতে পারে। হে আল্লাহ! আমি এই পবিত্রতার বেশি মুখাপেক্ষী। কারণ আমি কমযোর। মহেরবানী করে তাওফীক দাও! আমি যেন এই মাসটি তোমার সন্তুষ্টি মোতাবেক অতিবাহিত করতে পারি। এভাবে দু 'আ করলে আশা করি রমযান মাসটি আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক কাটানোর তাওফীক হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

যাকাতের প্রতি গুরুত্ব দিন

রমযান মাস সম্পর্কে সর্বশেষ একটি সংক্ষিপ্ত আবেদন করতে চাই। যাকাতের জন্য আল্লাহ বিশেষ কোনো মাস নির্ধারিত করেননি; কোনো ব্যক্তি যেদিন নেসাবের মালিক হয়, সেদিন থেকে চাঁদের তারিখ অনুযায়ী এক বছরের মাথায় তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয হয়। কিন্তু রমযান মাসে যেহেতু একটি ফরয আদায় করলে সত্তরটি ফরযের সওয়াব পাওয়া যায়, এজন্য রমযানে যাকাত আদায়ের প্রচলনটা ব্যাপক। এখানে এক টাকা খরচ করলে সত্তর টাকা খরচ করার সওয়াব পাওয়া যাবে। সুতরাং যার উপর যাকাত ফরয হবে, সে যেন অবশ্যই এ মাসে যাকাত আদায় করে। যাকাত আদায়ে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অবহেলা হয়, তা হল

যথার্থ হিসাব। অনেকেই যাকাত আদায় করে, কিন্তু আমি কত টাকার মালিক, আমার উপর কত টাকা যাকাত এসেছে, তার যথাযথ হিসাব সবাই করে না। আন্দায করে কিছু আদায় করে দেয়। অথচ সবার জন্য যথাযথ হিসাব করে যাকাত আদায় করা জরুরি।

দু 'আর প্রতি গুরুত্ব দিন

রমযান মাসে বেশি বেশি দু 'আর প্রতি গুরুত্বারোপ করুন। কারণ ইফতারের সময় দু 'আ ফেরত দেয়া হয় না। আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের দু 'আ ফেরত দেয়া হয় না। সাহরির সময়ের দু 'আ ফেরত দেয়া হয় না। যেন রমযানের চব্বিশ ঘন্টাই দু 'আ কবুলের দরজা উম্মুক্ত। সুতরাং নিজের আত্মসংশোধনের জন্য, পরিবার পরিজনের জন্য এবং সকল মুসলমানের জন্য বেশি বেশি দু 'আ করুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রমযানের আসল রূহ ও প্রাণ এবং আবেদন ও তাৎপর্য বোঝার এবং তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক রমযান মাস অতিবাহিত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী মাওয়ায়েজ (১/১৭২-১৯০)

নিল গম্বুজ জামে মসজিদ, লাহোর

রমযান মাসে দোয়া কবুল হয়

الكَرِيْمِ • بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ. نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِه

আল্লাহর রহমতের খাজানা সর্বদাই খোলা। বান্দার মধ্যে বন্দেগীর অনুভূতি থাকলে এবং চাওয়ার পন্থা সঠিক হলে, মহানুভব দাতা সব সময়ই তার দু 'আ শোনেন এবং কবুল করেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

"আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, আমি তার অতি নিকটে। সে যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দেই। সুতরাং তারা যেন আমার নিকট চায় এবং আমার উপর ঈমান রাখে। তাহলে তারা হেদায়াত পাবে।"

কিন্তু এই চব্বিশ ঘন্টার দিন-রাতে এমন কিছু সময় আছে, যখন আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় জোশ আসে। তখন দিল থেকে বান্দা যা চায়, তা-ই আল্লাহর রহমতে কবুল হয়ে যায়। হাদীসে এসেছে, কিছু সময় আল্লাহর রহমতের বিশেষ ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। তখন যোগ্য অযোগ্য সবাই তার উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়।

রমযান মাস হল আল্লাহর সেই বিশেষ রহমতের বসন্তকাল। এই মাসে তাঁর রহমতের বৃষ্টি মুষলধারে বর্ষিত হয়। বান্দার মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর রহমত বাহানা তালাশ করে বেড়ায়। কদমে কদমে দু 'আ কবুলের

ঘোষণা হয়। এই মাস দু 'আ কবুলের মাস। এই মাসে বেশি উপকৃত হওয়ার উপায় হল বেশি বেশি দু 'আ করা এবং নিজের প্রয়োজগুলো আল্লাহর কাছে চাইতে থাকা।

মু' জামে তাবারানিতে হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত, এক রমযানের শুরুতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই মাসে আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহমতের বিশেষ দৃষ্টি দেন। তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করেন, দু 'আ কবুল করেন। নেক কাজে তোমাদের প্রতিযোগিতা দেখে ফেরেশতাদের সঙ্গে তোমাদের নিয়ে গর্ব করেন। বড়ই দুর্ভাগা ঐ ব্যক্তি, যে এই রহমতের মাসেও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে।

মুসনাদে বায্যারের এক হাদীসে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযানের প্রতি দিন; প্রতি রাত, আল্লাহ জাহান্নামীদের মুক্তি দিতে থাকেন এবং প্রতি দিন; প্রতি রাত, প্রত্যেক মুসলমানের একটি দু 'আ অবশ্যই কবুল করেন।

এছাড়াও রমযানের বিশেষ বিশেষ সময় দু 'আ কবুল হতে থাকে। যেমন একটি সময় হল রোযা অবস্থায় দু 'আ করা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির দু 'আ ফেরত দেয়া হয় না। ইফতার করা পর্যন্ত রোযাদারের দু 'আ, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর দু 'আ এবং মজলুমের দু 'আ। তাদের দু 'আ আল্লাহ মেঘমালার উপর উঠিয়ে নেন এবং আসমানের দরজা খুলে দেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য করব। যদিও কোনো হেকমতের কারণে অনেক সময় হয়তো তা বিলম্বিত হয়।

কোনো বর্ণনায় ইফতারের সময়ের দু 'আ কবুল হওয়ারও ওয়াদা করা হয়েছে। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম, বুযুর্গানে দ্বীন এ সময় সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক মর্মসমৃদ্ধ দু 'আ করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করতেন।

রমযানের তারাবী ও তাহাজ্জুদের পরও দু 'আ কবুলের বিশেষ সময়। এ সময় দু 'আ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা উচিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রমযানে প্রতি রাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন আহ্বায়ক আহ্বান করেন হে কল্যাণপ্রত্যাশী! তুমি এগিয়ে যাও। হে অকল্যাণপ্রত্যাশী! তুমি পিছু হট। এরপর ফেরেশতারা আওয়াজ দেন আছো কোনো ক্ষমাপ্রার্থী? যাকে ক্ষমা করা হবে। আছো কোনো তাওবাকারী? যার তাওবা কবুল করা হবে। আছো কোনো প্রয়োজনপ্রার্থী? যার প্রয়োজন পূরণ করা হবে। এভাবে প্রতি রাত সুবহে সাদিক পর্যন্ত চলতে থাকে।

খোলাসা কথ হল, রমযানের দিনরাত দু 'আ মুনাজাতের দিনরাত। এ মাসের নির্ধারিত ইবাদত থেকে ফারেগ হয়ে, যখনই সুযোগ পাওয়া যায় আল্লাহর নিকট দু 'আ মুনাজাত করা চাই। এতে বান্দার উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার পাশাপাশি সবচে বড় ফায়দা হল, আল্লাহর সঙ্গে বান্দার খাস সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। এই সম্পর্ক ধীরে ধীরে বান্দাকে পাপ থেকে দূরে রেখে নেক কাজে অভ্যস্ত করে তুলে।

অনেক সময় মানুষের মনে চিন্তা আসে, আমি তো রমযানে অমুক অমুক দু 'আ করেছি, কিন্তু কবুল হয়নি। এজন্য এখানে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে।

প্রথম কথা হল, গাফেল অন্তর নিয়ে শুধু যবানে কিছু শব্দ উচ্চারণ করার নাম দু 'আ নয়; দু 'আ হল বান্দার মতো করে পূর্ণ দীনতা, হীনতা ও অক্ষমতার বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে, দিল থেকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার নাম। হাদীসে এসেছে, যেই দু 'আ অন্তরের গাফলতের সঙ্গে করা হয়, তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। সুতরাং দু 'আ যখনই করা হবে, সম্পূর্ণ দিল থেকে করতে হবে।

দ্বিতীয়ত হারাম গেযা খেয়ে দু 'আ করলে সেই দু 'আ কবুল হয় না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অনেক পেরেশান লোক আসমানের দিকে হাত তুলে দু 'আ করতে থাকে; ইয়া রব! ইয়া রব! বলে আল্লাহকে ডাকতে থাকে, অথচ তাদের খাবার হারাম; পোশাক হারাম। এঅবস্থায় তাদের দু 'আ কিভাবে কবুল হবে?

সুতরাং অন্তত রমযান মাসে বিশেষভাবে হালাল রুজির প্রতি গুরুত্বারোপ করা উচিত।

তৃতীয়ত দু 'আ কবুলের সঠিক অর্থ কি? তাও বোঝার বিষয়। অনেক সময় মানুষ নিজের অজ্ঞতার কারণে এমন বিষয় প্রার্থনা করে, যা তার জন্য কল্যাণকর নয়। তখন আল্লাহ তাকে প্রার্থিত বস্তুর পরিবর্তে এমন বস্তু দান করেন, যা তার জন্য কল্যাণকর। তখনও আমরা মনে করি, দু 'আ কবুল হয়নি; অথচ আমি যেই দু 'আ করেছি, তার চেয়েও উত্তমরূপে আল্লাহ আমার দোয় কবুল করেছেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা যতক্ষণ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার কিংবা গোনাহের দু 'আ না করে, ততক্ষণ তার দু 'আর মাধ্যমে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটি সে পেতে থাকে। ১. হয় প্রার্থিত বস্তুই সে পেয়ে যায়, ২. অথবা তার পরিবর্তে কোনো বিপদ দূর করে দেয়া হয় ৩. কিংবা আখেরাতের জন্য এই পরিমাণ সওয়াব তার আমলনামায় লিখে দেয়া হয়।

সুতরাং আল্লাহর নিকট প্রার্থিত কোনো বিষয় যদি পাওয়া না যায়, তাহলে একথা ভাবা ঠিক নয় যে, আমার দু 'আ কবুল হয়নি; বিফল হয়েছে। বরং দু 'আ যদি তার আদব ও নিয়ম রক্ষা করে হয়ে থাকে, তবে তা বিফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তার ফল তা-ই পাওয়া যাবে, যা চূড়ান্ত বিচারে বান্দার জন্য কল্যাণকর।

শেষ কথা হল, রমযানের দু 'আ শুধু নিজের জন্য সীমিত রাখা উচিত নয়; আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী, দেশ জাতি ও মুসলিম মিল্লাতসহ বিশ^জগতের কল্যাণ ও সফলতার দু 'আ করা চাই। আল্লাহ আমাদেরকে রমযানের বরকতময় সময়গুলো সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে যথাযথ উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : নশরী তাক্বরীরেঁ, পৃ. ৪৫-৪৯

রমযানে আমাদের ত্রুটিসমূহ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ

রমযানের মুবারাক মাস আমাদের উপর ছায়া বিস্তার করতে যাচ্ছে। এটা আল্লাহর রহমতের সেই বসন্তকাল, যেখানে বিশ্বজগতের স্রষ্টার পক্ষ থেকে, বান্দার প্রতি বিশেষ বিশেষ দান অনুদানের জন্য বাহানা তালাশ করা

হয়। যেখানে ঈমানের সম্পদে যারা সম্পদশালী, তাদের প্রতি রহমতে ইলাহীর অবিরত বারি বর্ষিত হয়। রহমত ও বরকতের দরজাগুলো প্রতি মুহূর্তের জন্য খুলে রাখা হয়। আল্লাহই জানেন, কত অসংখ্য মানুষের নাম তিনি জাহান্নামের দফতর থেকে কেটে তাদের জান্নাতের ফরমান লিখে দেন।

আল্লাহ তা 'আলার নূর ও তাজাল্লী, রহমত ও বরকতের এই ¯্রােতধারা, আমাদের সামনে দিয়ে প্রতি বছর প্রবাহিত হয়, কিন্তু আমরা আমাদের অদূরদর্শিতার দরুন তার মূল্যায়ন করতে পারি না। ফলে এই মূল্যবান মুহূর্তগুলোকে আমাদের গাফলতের বলি বানিয়ে বিসর্জন দেই। যাদেরকে আল্লাহ অন্তঃদৃষ্টি দান করেছেন, তারা অবশ্য ঠিকই এই মাসের মূল্যায়ন করে তা থেকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেন। হাদীসে এসেছে, খোদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; যিনি মাসুম ও নিষ্পাপ, আল্লাহর কাছে যিনি এমন মর্যাদা ও নৈকট্যের অধিকারী, যা নিকটতম কোনো ফেরেশতার পক্ষেও কখনো অর্জন করা সম্ভব নয়, তিনি পর্যন্ত অধীর আগ্রহে এই মাসের অপেক্ষা করতেন এবং রজব মাস আসলেই দু 'আ করতে থাকতেন

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

'হে আল্লাহ! আমাদের রজব ও শা 'বান মাসে বরকত দাও এবং রমযান পর্যন্ত আমাদের হায়াত বৃদ্ধি করে দাও।'

অসংখ্য বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁরা রমযানের একটি মুহূর্ত লাভ করাকে অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করতেন এবং কঠিন রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও তামান্না করতেন রমযান পর্যন্ত যদি হায়াতটুকু পেয়ে যেতাম! এমনকি রমযানের চাঁদটি দেখার সঙ্গে সঙ্গেও যদি হায়াত শেষ হয়ে যায়, তবুও অনেক বড় গনিমত ও সৌভাগ্যের বিষয়।

রহমত ও বরকতের এই পবিত্রতম মাসে, নি¤েœাক্ত হাদীসটি সকল মুসলামনের জন্য চিন্তার বিষয় এবং প্রতি মুহূর্তে স্মরণ রাখার বিষয়।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ সাহাবী; হযরত কা 'ব ইবনে উজ্রা রাযি. বলেন, একদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা মিম্বারের নিকট জমে বস। আমরা জমা হলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রথম সিঁড়িতে পা রাখলেন, বললেন আমীন। যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন, বললেন আমীন। যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন, তখনও বললেন আমীন।

হযরত কা 'ব রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বার থেকে অবতরণ করলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আজ আপনি মিম্বারে উঠে এমন একটি কাজ করেছেন, যা ইতিপূর্বে আমরা কখনো দেখিনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যখন প্রথম সিঁড়িতে পা রাখলাম, জিবরাঈল আ. আমার সামনে উপস্থিত হয়ে দু 'আ করলেন

بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ

'ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি, যে রমযান পেল; অথচ তাকে ক্ষমা করা হল না।'

তখন তার এই দু 'আয় আমি বললাম আমীন।

একটু চিন্তা করে দেখুন! যেই দু 'আ করেছেন খোদ হযরত জিবরাঈল আ. এবং তা কবুল হওয়ার সুপারিশ করে মিম্বার থেকে আমীন বলেছেন খোদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সেই দু 'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনো মুমিনের অন্তত সন্দেহ থাকার কথা নয়।

আসল কথা হল, রমযানের বরকতময় মাসের প্রতিটি মুহূর্তে বান্দাকে ক্ষমা করার বাহানা তালাশ করা হয়। মুহূর্তে মুহূর্তে রহমত বর্ষিত হয়। এমন ব্যাপক দান দক্ষিণার মাঝেও যে ব্যক্তি নিজের গোনাহগুলো ক্ষমা করিয়ে নিতে পারে না, তার অর্থ দাঁড়ায় সে নিজেকে আল্লাহর রহমত থেকে 'বে-নিয়ায' ও অমুখাপেক্ষী মনে করে। নাউযুবিল্লাহ। এটাই মূলত ভয়াবহ বিষয়, যার কারণে জিবরাঈল আ. তার ধ্বংসের জন্য বদ-দোয়া করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন বলেছেন। কারণ আল্লাহর রহমত থেকে নিজেকে বে-নিয়ায মনে করা কুফুরি।

আজকের মজলিসে মূলত এমন কিছু ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলব, যেগুলো আমরা বরাবরের মতো রমযান মাসেও করে থাকি এবং আশঙ্কা হয়, এই বিচ্যুতিগুলোর কারণে (আল্লাহ না করুন) আমিও না জানি আবার উপরোক্ত হাদীসের ভয়াবহ অভিশাপের শিকার হয়ে যাই।

সর্বপ্রথম ত্রুটি হল, আমরা এই মাসের মূল্য জানি না। এই মাস মূলত একটি তারবিয়ত ও প্রশিক্ষণকোর্স। যার বদৌলত আল্লাহ আমাদেরকে সারা বছরের পাপ পঙ্কিলতা ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করতে চান। সুতরাং শুধু রোযা রাখা এবং তারাবী পড়ার দ্বারাই এ মাসের হক আদায় হয়ে যায় না; বরং এই মাসের তাকাযা ও দাবি হল, পূর্ণ মাস আল্লাহর নাফরমানি থেকে মুক্ত থেকে; একমাত্র আল্লাহমুখী হয়ে; তাঁর ইবাদত বন্দেগীতে কাটানো। বিশেষ করে সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে রোযা পূরণ করার জন্য পানাহার বর্জন করে; যেই কাজগুলো রোযার পূর্বে স্বাভাবিক সময়ে হারাম ছিল, সেগুলো করতে থাকা তো রোযার সঙ্গে উপহাস করার নামান্তর। এজন্যই হাদীসে বলা হয়েছে, এমন রোযায় উপবাস ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয় না।

অন্যান্য কাজের জন্য সারা বছর পড়ে আছে, কিন্তু এই রকম রহমত ও বরকতপূর্ণ মূল্যবান মুহূর্ত পুরো বছরে দ্বিতীয় আরেকটি আসবে না। সুতরাং অন্যান্য কাজ শুধু প্রয়োজন পরিমাণ রেখে; বাকি পূর্ণ সময় ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করা এখন সময়ের দাবি। পানাহার বর্জনের রোযার সঙ্গে কান চোখ মুখ ও দিলের রোযাও রাখতে হবে। আল্লাহর দেয়া এই মেশিনগুলো আল্লাহর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার পূর্ণ চেষ্টা করতে হবে।

আমাদের অন্যতম ত্রুটি হল, আমরা পানাহার বর্জন করে কয়েক ঘন্টার রোযা রাখি ঠিক, কিন্তু মিথ্যা বলা, গীবত করা, গান শোনা, ঘুষ খাওয়া, ধোঁকা দেয়া, অন্যকে কষ্ট দেয়া ইত্যাদির মতো গোনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করি না। বিশেষত রমযান মাসে আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর এমন কিছু অতিরিক্ত ও অনর্থক বোঝা চাপিয়ে রাখি, যেগুলোর ব্যবস্থা হালালভাবে সম্ভব নয় বিধায়, অন্যায় পথে উপার্জনের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠি। ফলে রমযানের মতো মুবারাক মাসেও বে-ধড়ক সুদ ঘুষের কারবার চলতে থাকে। ব্যবসায়ী রোযামুখেও ভেজাল মিশ্রণ, ধোঁকা দেয়া, ঠকানো ও মাপে কম দেয়া ইত্যাদির মতো হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না। মোটকথা দুনিয়ার লোভ লালসা ও অর্থ সম্পদের নেশা বিন্দুমাত্র বাধাগ্রস্ত হয় না।

তাছাড়া আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা এজাতীয় গোনাহের কাজে লিপ্ত হয় না ঠিক, কিন্তু তারা রমযানের মূল্যবান সময়গুলোকে সভা সমাবেশ, অনর্থ কথন এমনকি অনেক সময় মিথ্যা ও গীবত চর্চার মতো জঘন্য কাজে নষ্ট করে দেয়। রমযান মাসকে হাদীসে

شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالْمُوَاسَاةِ

সবর ও সহমর্মিতার মাস বলা হয়েছে।

হাদীসের ভাষ্য নিম্নরূপ:

فَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ فِيهِ.

অর্থ: এটা ধৈর্যের মাস, ধৈর্যের বিনিময় জান্নাত, সাম্যের মাস, এটা এমন মাস যে মাসে মুমিনের রিযিক বাড়িয়ে দেয়া হয়।

কিন্তু আমাদের অনেকেই এ মাসে কথায় কথায় রেগে উঠি; ঝগড়া বিবাদের জন্য উদ্যত হই।

আমাদের আরেকটি ক্রটি এতই সীমাতিরিক্ত হয়েছে যে, যেখানে রমযান মাসে আমার দুনিয়ার ব্যস্ততা কমানোর কথা ছিল, সেখানে আমরা অনেকেই তা আরো বহগুণে বৃদ্ধি করে নেই। বিশেষত ব্যবসায়ী ভায়েরা তো এই মাসকে দুনিয়া উপার্জনের মৌসুম মনে করে, তাতে এই পরিমাণ আত্মনিয়োগ করে, যার ফলে অনেক সময় তাদের ফরয নামায পর্যন্ত কাযা হয়ে যায়। বেশ কিছুদিন থেকে যাদেরকে আলেম ও দ্বীনদার সম্প্রদায় মনে করা হয়, তাদের মধ্যে চাঁদা উঠানোর বিষয়টি এক নতুন ফেতনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা যেন এই মাসকে চাঁদা তোলার মাস বানিয়ে নিয়েছেন। বিভিন্ন মাদরাসার প্রতিনিধিরা এই মাসে দলে দলে বিভিন্ন শহরে চাঁদা তোলার প্রোগ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। এই মিশন এখন এতই অগ্রসর হয়েছে যে, এখন দেদারসে চাঁদা তোলার শরয়ী সীমারেখাও পদদলিত হচ্ছে এবং জায়েয নাজায়েযের পর্যন্ত কোনো তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। যারা বাস্তবেই চাঁদার নামে ধোঁকা 'বাজি করে, তাদের আলোচনা আর কি করব? যারা বস্তুত সততার সঙ্গে চাঁদা আদায় করেন, তারাও আজ এমন পন্থা অবলম্বন করছেন, যা কোনোভাবেই আলেমদের মান মর্যাদা ও 'গায়রতের' সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এতে আলেম উলামা ও দ্বীন ধর্মের ভাবমূর্তি যেমন ক্ষুণœ হচ্ছে, তেমনি রমযানের মতো বরকতময় মাসেরও অবমূল্যায়ন হচ্ছে।

আরেকটি বড় ফেতনা হল ঈদের প্রস্তুতি। কোনো সন্দেহ নেই, আল্লাহ ঈদকে মুসলমানদের আনন্দের জন্য দিয়েছেন এবং এই দিন সামর্থ্য আনুযায়ী উত্তম পোশাক পরিধানের প্রতিও উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু আজকের সমাজে এই উপলক্ষে আড়ম্বরতা ও অপচয়ের যেই সয়লাবকে ঈদের অপরিহার্য অংশে রূপান্তরিত করা হয়েছে, তার সঙ্গে যে দ্বীন ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আজকের অবস্থা হল, কারো সামর্থ্য থাকুক বা না থাকুক, যে কোনো উপায়ে তাকে ঘরের প্রত্যেকের জন্য ফ্যাশনেবল নতুন এক সেট কাপড়ের ব্যবস্থা করতেই হবে। জুতা থেকে টুপি পর্যন্ত, প্রত্যেকটিই নতুন হতে হবে। এমনকি ঘরেও অনেক নিত্য নতুন আসবাব পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের দামি দামি ঈদকার্ড পাঠাতে হবে। এসব ক্ষেত্রে কারো থেকে পিছিয়ে থাকা যাবে না কিছুতেই।

ফলে এখন মধ্যবিত্ত লোকদের জন্য পর্যন্ত ঈদের প্রস্তুতি এক মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা যখন দেখছেন, স্ত্রী সন্তানের ঈদ-বায়না পূরণ করার জন্য বৈধ উপার্জন যথেষ্ট নয়, তখন তারা অবৈধ উপায় অবলম্বন করে অন্যের পকেট মারছেন।

এরকম ঈদপ্রস্তুতির সর্বনিম্ন ক্ষতি হল, রমযানের; বিশেষ করে শেষ দশকের যে রাতগুলো নির্জনে আল্লাহর সান্নিধ্যে কাটানোর কথা ছিল, সেই রাতগুলো বাজারের কোলাহল ও নাফরমানির পরিবেশে বরবাদ হয়ে যায়।

রমযান মাসে আমাদের আরেক মহামারি হল, সভা সমাবেশ ও ওয়াজ মাহফিল। রমযান মাস মূলত কথার সময় নয়; আমলের সময়। বিশেষ করে শেষ দশকের রাতগুলো শুধুই এজন্য যে, তাতে আল্লাহ যতটুকু তাওফীক দান করেন, তা যেন একাকিত্বে দু 'আ যিকির তিলাওয়াতসহ বিভিন্ন নফল ইবাদত বন্দেগীতে কাটানো যায়। কিন্তু এসব মাহফিলের কারণে এখন রাতের অধিকাংশই 'মজাদার' ওয়াজ নসিহতে চলে যায়;

আমলের সময় আর থাকে না। মসজিদে আলোকসজ্জা ও রাতজাগার যৌথ আয়োজনের কারণে, এসকল ব্যবস্থাপনার ধান্দায়ই সময় পার হয়ে যায়; এসব রাতের আসল যে উদ্দেশ্য, সেদিকে খেয়াল করার সময়ই পাওয়া যায় না। এরকম অনেক জায়গায়ই দেখা যায়; সবিনা হয়, ওয়াজ মাহফিলের নামে হৈ হুল্লুড় পড়ে যায়। বাচ্চারা খেলাধুলায় মেতে উঠে; বড়রা আলোকসজ্জা ও ডেকোরেশনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; সাহরির পাকশাকের ধুম লেগে যায়। মহল্লা কে মহল্লা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহর সঙ্গে দিলের সম্পর্ক মজবুত করার যেই মূল কাজ ছিল, তা থেকে সম্পূর্ণ বে-খবর হয়ে এই মূল্যবান সময়টা নষ্ট করে ফেলে।

আমার এই আবেদনগুলোর উদ্দেশ্য; আল্লাহ না করুন, কারো দোষারোপ কিংবা সমালোচনা নয়; বরং কল্যাণকামিতা এবং মুহাব্বতের সঙ্গে আমার নিজেকেসহ সকল মুসলমানের নিকট একটি ফিকিরের পয়গাম পৌঁছে দেয়া। এই রমযান মাস আল্লাহ কোন্ কাজের জন্য দিয়েছেন এবং আমরা তা কোন কাজে নষ্ট করছি?

আমরা বছরের এগারটি মাস প্রায় আমাদের নফসানী খাহেশাতের পিছনেই ব্যয় করি। মাত্র ত্রিশটি দিনের জন্য কি এতটুকুও করতে পারি না যে, আমি অন্তত আল্লাহর প্রকাশ্য নাফরমানিগুলো থেকে বিরত থাকব? আমরা যদি আমাদের পূর্বসূরীদের মতো রমযানের পূর্ণ সময়টা ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতে নাও পারি, অন্তত গোনাহ থেকে তো বাঁচা দরকার। আমরা যদি অন্যকে অগ্রাধিকার দিতে কিংবা সহমর্মিতার উজ্জ্বল কোনো দৃষ্টান্ত পেশ করতে নাও পারি, অন্তত অন্যকে কষ্ট দেয়া কিংবা ধোঁকা দেয়া থেকে তো বিরত থাকা দরকার। একনিষ্টতা ও এখলাসের সঙ্গে যদি আমি রাত্রি জাগরণ করতে না পারি, অন্তত রমযানের মতো মুবারাক রাতে অনুষ্ঠানসর্বস্ব 'ইবাদতের মেলা' বসিয়ে রমযানের পবিত্রতার প্রতি উপহাস প্রদর্শন থেকে তো নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি।

আমাদের মধ্যে যদি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত থাকে; আমরা যদি তাঁর শাফা 'আত-প্রত্যাশী হই এবং তাঁর বদ-দোয়ার ভয় আমাদের অন্তরে থাকে, তাহলে আমাদের সকলের অন্তরের দিকে একটু উঁকি দিয়ে অতীত জীবনের হিসাব নেয়া দরকার। রমযানের শুরুতেই অতীত জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতি হতে দিল থেকে তাওবা করে আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করা দরকার এই মাসে আমি কোনো গোনাহ করব না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহমুখী হয়ে রমযান অতিবাহিত করার চেষ্টা করব। রমযানের পবিত্র সময়গুলো আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক কাটাবার পূর্ণ চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে এভাবে ওয়াদা করার তা পূরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

রমযানের বরকতপূর্ণ সময়গুলো দু 'আ কবুলের সুবর্ণ সুযোগ। পাঠকদের নিকট আবেদন, তারা যেন নিজেদের জন্য দু 'আ করার সময়, মাসিক 'আলবালাগ' ও তার কর্মকর্তা কর্মচারি এবং দারুল উলূম ও দারুল উলূমের শিক্ষক কর্মচারি ও খাদেমদের কথাও স্মরণ রাখেন। দেশ ও দেশবাসীর জন্য দু 'আ করেন। তারা যেই জাহেরী বাতেনী ফেতনায় জর্জরিত, তা থেকে আল্লাহ তাদের নাজাত দেন। মুসলিম বিশে^র জন্যও দু 'আ করবেন, আল্লাহ যেন সকল মুসলমানকে সময়ের সব ধরনের ফেতনা থেকে মুক্ত করে; তাদেরকে পুনরায় ইজ্জত সম্মানের জীবন দান করেন। আমীন।

সূত্র : 'র্ফদ কি ইসলাহ' পৃ. ৫৫-৬০

রমযান মাসে আমাদের দায়িত্ব

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ

অচিরেই রমযান মাস আমাদের উপর ছায়া বিস্তার করতে যাচ্ছে। এই মাসটি আল্লাহর রহমতের সেই বসন্তকাল, যেখানে বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। যেখানে অসংখ্য মানুষকে ক্ষমা করা হয়। যার প্রতিটি মুহূর্ত বান্দার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির পয়গাম নিয়ে উপস্থিত হয়।

এটি ইবাদতের মাস। এখানে দুর্বল মুসলমানদেরও ইবাদতের আগ্রহ উদ্দীপনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। মসজিদগুলো ভরপুর আবাদ হয়। এখানে নি œ থেকে নি œ রুচির লোকও ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করে। এটি দু 'আ মুনাজাতের মৌসম। এ সময় প্রতি মুহূর্তে দু 'আ কবুলের দরজা উম্মুক্ত থাকে। বান্দাকে প্রতি রাতে আহ্বান করা হয়, তোমার কি চাহিদা পেশ কর, কবুল করা হবে।

এই মাস বান্দার গোনাহ মাফ করার মাস। এ সময় বান্দাকে ক্ষমা ও দয়া করার জন্য মামুলি মামুলি বাহানা তালাশ করা হয়। এজন্যই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির জন্য বদ-দোয়া করেছেন, যে এমন রহমতপূর্ণ মাস পেয়েও নিজের গোনাহগুলো ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না।

আল্লাহর রহমতের এই বার্ষিক উৎসব, যার প্রতিটি মুহূর্ত বান্দার জন্য তাঁর রহমতের খাজানা উপুড় করে ঢালতে থাকে, তা আমাদের মাথার উপর ছায়া বিস্তার করতে যাচ্ছে। আমাদের মতো অন্ধরা এই মাসের মূল্য জানি না। ফলে তার আগমনের বিশেষ প্রস্তুতিও নিই না। কিন্তু হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; যিনি সঠিক অর্থে এই সময়ের রহমত ও বরকত এবং নূর ও নূরানিয়াতের রায ও রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন, তিনি অনেক পূর্ব থেকে পূর্ণ আগ্রহ নিয়ে রমযানের প্রতীক্ষার প্রহর গুনতেন। যখন রজবের চাঁদ দেখতেন, তখন থেকেই দু 'আ করতে থাকতেন

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

'হে আল্লাহ! আমাদের রজব ও শা' বান মাসে বরকত দাও এবং রমযান পর্যন্ত আমাদের হায়াত দারাজ করে দাও।'

আমাদের কাছে রমযান মাসের একটিমাত্র তাকাযা; একটিমাত্র দাবি। আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া; আল্লাহমুখী হওয়া। এ মাসের আসল উদ্দেশ্য হল, দীর্ঘ এগার মাসে আমাদের দিল দেমাগ ও মন মগজ নানামুখী হাজারো ধান্দায় যেভাবে বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তা আল্লাহমুখী করে একমাত্র আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে; আসল মাকসাদে হায়াতইবাদতের প্রতি মনোযোগ দেয়া। সকল মুসলমানের জন্য এটি একটি বার্ষিক তারবিয়তি কোর্স, যা গ্রহণ করলে পতিত বান্দা আবার সঠিক পথে উঠে পথ চলতে শুরু করবে। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার রমযান মাস সঠিকভাবে অতিবাহিত হল, তার পুরো বছর সঠিকভাবে পরিচালিত হবে।

যখন থেকে মুসলমানদের মাঝে পশ্চিমা চিন্তা চেতনার প্রভাব বিস্তার করেছে এবং উলামায়ে কেরাম তার মোকাবেলায় ইসলামের বস্তুগত বরকত এবং দুনিয়াবী কল্যাণ ও সৌন্দর্যগুলো সুস্পষ্টরূপে আলোচনা শুরু করেছেন, তখন থেকে ইসলামের আত্মিক ও রুহানী বিষয়গুলো পিছনে চলে গেছে। এখন আমাদের লেখা ও

আলোচনার অধিকাংশই ব্যয় হচ্ছে ইসলামের বাহ্যিক ও জাগতিক সৌন্দর্য নিয়ে। ইসলামে অত্যন্ত সুন্দর একটি অর্থব্যবস্থা আছে, যা অবলম্বন করলে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক সুন্দর হতে পারে। ইসলামে অত্যন্ত চমৎকার সুসম একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা আছে, যা অনুসরণ করলে আমরা একটি সুন্দর রাষ্ট্রব্যবস্থা পেতে পারি। ইসলামের সামাজিক শিক্ষাগুলো এত সুন্দর, যেগুলো বাস্তবায়ন করলে মুসলিম সমাজ উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারে।

বিষয়গুলো সবই আপন আপন জায়গায় শতভাগ সঠিক, কিন্তু এ কথা আমাদের কখনো ভুলে গেলে চলবে না যে, ইসলামের এইসব সৌন্দর্য দ্বিতীয় স্তরের মর্যাদা রাখে। আল্লাহর দ্বীনের বুনিয়াদি মাকসাদ, যার উপর দ্বীনের সকল বিধি বিধানের ইমারত নির্মিত হয়েছে, তা হল আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক জোড়া। তাদের অন্তরে আল্লাহর আজমত ও মুহাব্বত, সম্মান ও মাহাত্ম এবং ভয় ও আশা সৃষ্টি করা। তাঁর রহমতের সঙ্গে বান্দার অনিঃশেষ এক সম্পর্ক গড়ে তোলা। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি কাজে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা; তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তাঁর উপর ভরসা রাখার প্রেরণা জাগ্রত করা। এ বিষয়গুলো তৈরি হয় অধিক পরিমাণে আল্লাহর ইবাদত ও যিকিরের মাধ্যমে।

কোনো সন্দেহ নেই, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তার কল্যাণ ও সুফল বে-নজীর। ইসলামের রাজনৈতিক শিক্ষা অতুলনীয়। সামাজিক ব্যবস্থাও শতভাগ মানবিক ও কল্যাণময়। কিন্তু সবগুলোরই মূল ভিত্তি হল আল্লাহমুখিতা। যতক্ষণ মানুষের অন্তরে তা তৈরি না হবে, ততক্ষণ এই ব্যবস্থাগুলোর কোনোটিই সুন্দরভাবে চলতে পারে না এবং তার সুফলও প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে মানবগোষ্ঠীর কোনো সম্প্রদায় যদি তাদের রূহ ও আত্মার সংশোধন করে; আল্লাহর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করে এবং নিজেদের মধ্যে ঐসব গুণাবলী অর্জন করে, যা ইসলাম কামনা করে, তখন ইসলামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ নিজ থেকেই উন্মোচিত হয়। তর্কের খাতিরে যদি কিছুক্ষণের জন্য একথা মেনেও নেয়া হয় যে, এমন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত কোনো মানবগোষ্ঠী, চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেরকম সুন্দর কোনো অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, তবুও ইসলামের মূল উদ্দেশ্যে তাদেরকে ব্যর্থ বলার সুযোগ নেই। কিন্তু বাস্তবতা হল, এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোনো গোষ্ঠী সার্বিক ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক পন্থায় চেষ্টা করলে, কখনো তা ব্যর্থ হওয়া সম্ভব নয়।

এই দৃষ্টিতে একজন মুসলমানের মৌলিক বিষয় হল, নিজের মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের সেই প্রেরণা তৈরি করা, যা ইসলামে কাম্য। রমযান মাস এই উদ্দেশ্য সাধনে উত্তম সহায়ক। এই মাসের মূল উদ্দেশ্যই হল, মুসলমান তার অধিক থেকে অধিক সময় আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে কাটাবে। নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে জীবনে ভারসাম্য তৈরি করবে এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য তারবিয়ত ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে।

সুতরাং রমযানের সময়গুলো গনিমত মনে করে আমাদের উচিত

১. দুনিয়াবী ব্যস্ততা যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনা।

২. যতদূর সম্ভব নফল আমলের প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

৩. তেলাওয়াতে কুরআন, যিকির আযকার, তাসবীহ তাহলীল ইত্যাদি বাড়িয়ে দেয়া

৪. গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার পূর্ণ চেষ্টা করা এবং অগত্যা কোনো গোনাহ হয় গেলে তৎক্ষণাত তাওবা করা।

৫. অন্যান্য চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যতদূর সম্ভব নিজের ইসলাহ ও সংশোধনে আত্মনিয়োগ করা এবং আখেরাতের ফিকির বাড়িয়ে দেয়া।

৬. দান সদকাসহ বিভিন্নভাবে আল্লাহর রাস্তায় অধিক থেকে অধিক খরচ করা এবং গরীব দুঃখীদের বেশি বেশি খোঁজ খবর নেয়া।

৭. নিয়মিত নির্ভরযোগ্য দ্বীনি বইপত্র পড়া।

যদি একটি মাস এভাবে কাটাতে পারি, আশা করি এমনিতেই অন্তর নরম হয়ে যাবে এবং ইসলাহ ও সংশোধনের পথ সহজ হয়ে যাবে। এরপর পুরো বছর নিজেকে ইসলামের উপর পরিচালিত করাও অনেক সহজ হবে। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদা

إذا سَلِمَ رَمَضانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ

'যখন রমযান নিরাপদে কাটবে, পুরো বছর নিরাপদে কাটবে।'

আরেকটি বিষয় রমযানে বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

এখন পুরো বিই বিভিন্ন ফেতনায় জর্জরিত। বিশেষত কিছুদিন থেকে পাকিস্তান খুব কঠিন সঙ্কটের সম্মুখীন। আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কঠিন ষড়যন্ত্রের শিকার। অবস্থা এতই নাযুক যে, এখন দেশের অস্তিত্বই প্রায় হুমকির মুখে পতিত।

এই দূরাবস্থা থেকে উত্তরণের বাহ্যিক চেষ্টা এ পর্যন্ত বিভিন্ন অঙ্গন থেকে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। ভবিষ্যতেও তা চালু থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, যাতে আমাদের গাফলত ও অবহেলা চরম অপরাধের পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিষয়টি হল আমাদের সামনে যখন কোনো বিপদ আসে, আমাদের দৃষ্টি তখন দুনিয়ার উপায় উপকরণ ও বস্তুর প্রতি নিবিষ্ট হয় এবং সেখানেই সীমিত থাকে। অথচ একজন মুমিনের নিকট বাহ্যিক উপায় উপকরণের বাইরে আরো শাক্তিশালী একটি অস্ত্র বিদ্যমান। যা সব মুমিন সর্বদা সবখানে সমানভাবে ব্যবহার করতে পারে। তা হল একনিষ্ঠভাবে খুশূ খুজূর সঙ্গে আল্লাহর দরবারে দু 'আ করা। দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের ইসলামী ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানরা সব সময় এই দু 'আকে বাহ্যিক উপায় উপকরণের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং সকল বিপদ আপদে দু 'আর উপরই ভরসা রেখেছে।

ইদানিং আমরা এই বিষয়টি যেন একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি। কারো উপর ব্যক্তিগত কোনো বিপদ আসলে হয়তো সে কখনো দু 'আর প্রতি মনোনিবেশ করে, কিন্তু জাতীয় সম্যাগুলোর সমাধানে দু 'আর শরণাপন্ন হওয়ার লোক যেন একেবারেই হারিয়ে গেছে।

রমযান মাস দু 'আ কবুলের মৌসুম। আমাদের সবার দায়িত্ব ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও জাহেরী বাতেনী সব ধরনের উন্নয়ন অগ্রগতির জন্য খুশূ খুজূর সঙ্গে দু 'আ করা। যেই নাযুকতর সঙ্কটে পাকিস্তান জর্জরিত, তার সহজ ও দ্রুততম সমাধানে আল্লাহর সাহায্য তলব করা। আল্লাহ পাকিস্তানকে তাঁর নিজ হেফাজতে নিরাপদ রাখুন। দুশমনদের ব্যর্থ করুন। পাকিস্তানের বাসিন্দাদের ইসলাম মোতাবেক জীবন যাপন করার এবং পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার তাওফীক দান করুন। পাকিস্তানের শাসক, শাসিত; সকলকে আল্লাহ ঈমানের সম্পদে সম্পদশালী করুন। আমীন।

সূত্র : 'ফর্দ কি ইসলাহ' পৃ. ৫১-৫৪

রমযান রহমতের বিশেষ মাস

اَ لْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَ عَلٰى اٰلِه

وَ أَصْحَابِه أَجْمَعِيْنَ

أَمَّا بَعْد • .

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۝ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ ۝

[অর্থ: রমযান মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য (আদ্যপান্ত) হিদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন এ সময় অবশ্যই রোযা রাখে।]

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! এই রমযান মাস আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত। আমি আপনি কি করে এই মহান মাসের মূল্য ও তাৎপর্য বুঝব? আমরা তো দিন-রাত দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তুচ্ছ দুনিয়া ও দুনিয়ার সহায় সম্পদ এবং বস্তুচিন্তার ধান্দায় হারিয়ে যাই। আমরা কিভাবে বুঝব রমযান কি জিনিস? আল্লাহর বিশেষ দয়া ও মেহেরবানী যাদের প্রতি হয় এবং এই মাসে রহমত বরকতের সয়লাব সম্পর্কে যারা অবগত, তারাই তো এর মূল্য সম্পর্কে অবহিত। আপনি এই হাদীস শুনে থাকবেন, যেখানে রজবের চাঁদ দেখলেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু 'আ আরম্ভ করতেন

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

'হে আল্লাহ! আমাদের রজব ও শা 'বান মাসে বরকত দান করুন এবং আমাদের হায়াত রমযান পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করুন।'

চিন্তা করে দেখুন! রমযানের দুই মাস আগে থেকে অধীর আগ্রহ নিয়ে রমযানের জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুণছেন এবং তা পাওয়ার জন্য দু 'আ

আরম্ভ করছেন! এই কাজ এমন ব্যক্তিই করতে পারেন, যিনি রমযানের যথার্থ মূল্য জানেন।

বয়স বৃদ্ধির দু 'আ

এখান থেকে বোঝা গেল, কেউ যদি নেক কাজের নিয়তে অধিক বয়সের দু 'আ করে, তবে তা উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এমন দু 'আ করা চাই, হে আল্লাহ! আমাকে এই পরিমাণ হায়াত বাড়িয়ে দিন, যাতে আমি আপনার সন্তুষ্টি মোতাবেক কাজ করতে পারি এবং আপনার কাছে যাওয়ার সময় আপনার সন্তুষ্টি নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু কিছু মানুষ দু 'আ করে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এখনই দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও এমন দু 'আ করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন এবং মৃত্যুর তামান্না করতেও নিষেধ করেছেন।

আরে ভাই! তুমি ভেবেছ এখন দুনিয়ার অবস্থা ভালো না। আল্লাহর কাছে যখন চলে যাব, আমার শান্তির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এই আশা করার আগে একটু নিজের আমলের খোঁজ নিয়ে তো দেখা দরকার তুমি আল্লাহর কাছে সুখ শান্তির জন্য কি আমল পাঠিয়েছ? এখন যদি মৃত্যু চলে আসে, কি নিশ্চয়তা আছে যে, তোমার সঙ্গে ভালো আচরণ করা হবে? এজন্য সব সময় দু 'আ করা চাই হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নিরাপত্তা চাই। যতক্ষণ তুমি হায়াত রেখেছ, ততক্ষণ তোমার সন্তুষ্টি মোতাবেক চলার তাওফীক দান কর।

হায়াত সম্পর্কে রাসূল সা.-এর দু 'আ

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হায়াত কামনা করে যেই দু 'আ করতেন তা হল

اللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

'হে আল্লাহ! আমার জন্য যতক্ষণ জীবন উত্তম, ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখ। আর যখন আমার জন্য মৃত্যু উত্তম হবে, তখন আমাকে মৃত্যু দান করো।'

উক্ত হাদীস থেকে বোঝা গেল, এই দু 'আ করা যায় হে আল্লাহ! আমাকে এই পরিমাণ হায়াত বৃদ্ধি করে দাও, যাতে আমি তোমার সন্তুষ্টি মোতাবেক আমল করতে পারি। এমনিভাবে এই দু 'আও করা যায় হে আল্লাহ! রমযান পর্যন্ত আমার হায়াত বৃদ্ধি করে দাও।

রমযানের প্রতীক্ষা কেন?

প্রশ্ন হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান পাওয়ার এই আগ্রহ ও প্রতীক্ষা কেন করতেন? কারণ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন রমযানকে তাঁর নিজের মাস সাব্যস্ত করেছেন। আমরা যেহেতু বাহ্যিক দৃষ্টির মানুষ, এজন্য বাহ্যত আমরা শুধু এতটুকুই বুঝি যে, এটি রমযানের মাস। দিনে রোযা রাখতে হবে; রাতে তারাবী পড়তে হবে। ব্যস এতটুকুই। বস্তুত বিষয়টি এতটুকু নয়; বরং রোযা তারাবী কিংবা রমযানের অন্য যে কোনো ইবাদতই হোক না কেন, সবই মূলত আরেকটি বড় বিষয়ের আলামত ও নিদর্শন। বিষয়টি হল, আল্লাহ এই মাসটিকে তাঁর মাস সাব্যস্ত করেছেন। যাতে দীর্ঘ এগার মাস, দুনিয়ার বিভিন্ন ধান্দা ও চক্রান্তের শিকার হয়ে আল্লাহর সঙ্গে মানুষের যেই দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তা থেকে তাদের

উত্তরণ হতে পারে। এতদিন বান্দার চিন্তা চেতনা ও কর্মতৎপরতা যেভাবে দুনিয়া নিয়ে মগ্ন ছিল, তা থেকে ফারেগ হয়ে কিছুদিন আল্লাহর সান্নিধ্যে যাপন করতে পারে। এগার মাসে তৈরি হওয়া দূরত্ব কাটিয়ে তাঁর

নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। সুতরাং রমযান আমাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্যলাভে ধন্য হওয়ার মাস।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

দেখুন! মানুষকে আল্লাহ একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

'আমি মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।'

মানুষের জীবন তথা তার দুনিয়াতে আগমন ও অবস্থানের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত করা।

ফেরেশতা কি ইবাদতের জন্য যথেষ্ট ছিল না?

কারো মনে যদি প্রশ্ন হয় এ উদ্দেশ্যে তো প্রথমে ফেরেশতাদেরই সৃষ্টি করা হয়েছিল, এখন আবার নতুন করে একই উদ্দেশ্যে মানুষ তৈরি করার কি প্রয়োজন ছিল? ফেরেশতারা কি তাহলে ইবাদতের জন্য যথেষ্ট ছিল না?

উত্তর হল, ফেরেশতাদেরকে যদিও ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু তাদের সৃষ্টি হয়েছে এমন স্বভাব ও প্রকৃতিতে, যাতে জন্মগতভাবেই তারা ইবাদত করতে বাধ্য ছিল। তাদের স্বভাবে শুধু ইবাদতের প্রকৃতিই রাখা হয়েছে; ইবাদত ব্যতীত গোনাহ ও নাফরমানির কোনো স্বভাব তাদের মধ্যে রাখা হয়নি। তাই তাদের গোনাহের ইচ্ছাও হয় না এবং গোনাহ করতেও পারে না।

পক্ষান্তরে মানুষ এমন স্বভাব ও প্রকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে নেক ও সওয়াব করার যোগ্যতা যেমন রাখা হয়েছে, তেমনি গোনাহের যোগ্যতা ও স্বভাবও রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, গোনাহের প্রতি আকর্ষণও রাখা হয়েছে তার স্বভাবে। তারপর তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, গোনাহ না করে তুমি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর।

এ কারণে ফেরেশতাদের জন্য ইবাদত করা সহজ; কোনো কষ্ট ক্লেশ ছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তাদের দ্বারা ইবাদত সংঘটিত হয় অনেকটা মেশিনের মতো। পক্ষান্তরে মানুষের মধ্যে গোনাহের স্বভাব ও নফসের চাহিদা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রয়োজন ও দুর্বলতা এবং নাফরমানির প্রতি আকর্ষণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তারপরও তাকে এগুলোর মোকাবেলা করে; নাফরমানির চাহিদা ও নফসের খাহেশগুলো কুরবানি করে আল্লাহর ইবাদতের হুকুম দেয়া হয়েছে।

ইবাদত দুই প্রকার

এখানে আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে। যা না বোঝার কারণে অনেক সময় গোমরাহির শিকার হতে হয়। একদিকে বলা হয়, মুমিনের প্রত্যেক কাজই ইবাদত। অর্থাৎ মুমিন যদি নেক নিয়তে; সুন্নত তরীকায় কাজ করে, তাহলে তার উঠা বসা, চলা ফেরা, খাওয়া পরা, মেলা মেশা, লেন দেন, ব্যবসা বাণিজ্য, এমনকি স্ত্রী সন্তানের সঙ্গে তার হাসি খুশি সবকিছুই ইবাদত হিসাবে গণ্য হয়। প্রশ্ন দাঁড়ায়, বান্দার এই কাজগুলোও যদি নামায রোযার মতো ইবাদত হয়, তাহলে নামায আর খাওয়ার মাঝে পার্থক্য থাকল কোথায়?

পার্থক্য অবশ্যই আছে। এই পার্থক্য খুব ভালো করে বুঝতে হবে। কারণ তা না বোঝার কারণে অনেকে গোমরাহিতে নিপতিত হয়।

ইবাদত মূলত দুই প্রকার: প্রথম প্রকার 'ইবাদতে মাকসুদা'

এক প্রকার হল ইবাদতে মাকসুদা। অর্থাৎ এই প্রকারকে আল্লাহ ইবাদত হিসাবেই বান্দার জন্য বিধিত করেছেন। আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত এগুলোর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। যেমন নামায। নামাযের একমাত্র উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর ইবাদত করবে; আল্লাহর সামনে মাথানত করে নিজেকে ধন্য করবে। সুতরাং নামায হল ইবাদতে মাকসুদা। এমনিভাবে রোযা, হজ¦, যাকাত, তিলাওয়াত, যিকির আযকার ইত্যাদি। এগুলো সব একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে বিধিত হয়েছে। ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এগুলো প্রয়োগের অবকাশ নেই।

দ্বিতীয় প্রকার ইবাদতে গাইরে মাকসূদা

পক্ষান্তরে এমন কিছু আমল আছে, যেগুলো বিধিত হওয়ার উদ্দেশ্য ভিন্ন। যেমন দুনিয়াবী কোনো প্রয়োজন পূরণ করা কিংবা বান্দার কোনো চাহিদা মেটানো ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহ মেহেরবানী করে বান্দাকে এই সুযোগ করে দিয়েছেন যে, তুমি দুনিয়ার এই কাজগুলোও যদি নেক নিয়তে; আমার নির্ধারিত সীমানায় থেকে; রাসূলের সুন্নত মোতাবেক আঞ্জাম দাও, তবে এগুলোর উপরও তোমাকে ইবাদতের সওয়াব দেয়া হবে। সুতরাং এগুলো প্রত্যক্ষ ইবাদত না হলেও আল্লাহর বাতানো পন্থা ও নেক নিয়তের সূত্রে এগুলোও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

হালাল উপর্জন ইবাদতে গাইরে মাকসূদা

বান্দা যদি স্ত্রী সন্তানদের হক, নিজের নফস ও আত্মীয় স্বজনের হক আদায়ের জন্য, জায়েয নাজায়েযের সীমানা ঠিক রেখে, সঠিক পথে হালাল উপার্জন করে, তাহলে এটাকেও আল্লাহ ইবাদত বানিয়ে দিবেন। তবে এই উপার্জন মূলত ইবাদত হিসাবে বিধিত হয়নি। সুতরাং এটা প্রত্যক্ষ ইবাদত নয়; বরং নেক নিয়তের সূত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ে ইবাদত।

ইবাদতে মাকসূদা উত্তম

বিশ্লেষণ থেকে বোঝা গেল, যেগুলো ইবাদতে মাকসূদা, সেগুলো ইবাদতে গাইরে মাকসূদা থেকে উত্তম। আল্লাহ যে বলেছেন, আমি জি¦ন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য তৈরি করেছি, সেখানেও প্রথম স্তরের ইবাদতে মাকসূদা উদ্দেশ্য; দ্বিতীয় প্রকার নয়।

জনৈক ডাক্তারের ঘটনা

কয়েকদিন আগে আমাকে এক মহিলা প্রশ্ন করেছিলেন, আমার স্বামী ডাক্তার। তিনি একটি ক্লিনিক পরিচালনা করেন। সেখানে রুগী দেখেন; রুগীদের সেবা করেন। কাজের সময় তিনি নামায আদায় করেন না; রাতে যখন বাসায় ফেরেন, একসঙ্গে দিনের সবগুলো নামায কাযা করে নেন। আমি তাকে বললাম, আপনি বাসায় এসে একসঙ্গে কেন সব নামায আদায় করেন? ক্লিনিকেই সময়মতো সব আদায় করে নিবেন। যাতে কোনো নামায কাযা না হয়। উত্তরে তিনি বললেন, আমি তো সারাদিন ক্লিনিকে রুগীদের খেদমত করি। খেদমতে খালক অনেক বড় ইবাদত। আর এটার সম্পর্ক বান্দার হকের সঙ্গে। এজন্য এটাকে অগ্রাধিকার দেই। নামায আমার ব্যক্তিগত বিষয়। এজন্য পরে বাসায় এসে একসঙ্গে তা আদায় করি। মহিলা আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমি তার দলীলের কি উত্তর দিব?

নামায কোনো অবস্থায়ই মাফ নেই

বস্তুত ঐ ব্যক্তি এখান থেকে ভুলের শিকার হয়েছেন যে, দুই প্রকার ইবাদতের পার্থক্য তিনি বোঝেননি। নামায হল প্রথম স্তরের ইবাদতে মাকসূদা। এটা এতই গুরুত্বপূর্ণ, যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, তোমরা যদি যুদ্ধরত থাক এবং দুশমন সামনে উপস্থিত থাকে, তবুও তোমাদেরকে নামায আদায় করতে হবে। যদিও তখন

নামায আদায়ের পদ্ধতি সহজ করা হয়েছে, কিন্তু এমন কঠিন মুহূর্তেও নামায থেকে ছাড় পাওয়ার সুযোগ নেই। নামায সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

'নিশ্চয় নামায সুনির্দিষ্ট সময়ে মুমিনদের উপর ফরয।'

এবার বলুন, জিহাদ থেকে বড় আমল আর কি আছে? এখানে এমন বিপদসঙ্কুল মুহূর্তেও নির্দেশ হচ্ছে, নামায আদায় কর।

খেদমতে খালক ইবাদতে গাইরে মাকসূদা

কোনো ব্যক্তি যদি এত বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, কোনো কাজই সে করতে পারে না, তবুও তার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ নামায ছাড়তে পারবে না। দাঁড়িয়ে না হয় বসে, বসে না হয় কাত হয়ে কিংবা চিত হয়ে; রুকু সেজদা না করতে পারলে চোখের ইশারায় যে কোনোভাবে নামায তোমাকে আদায় করতেই হবে। অজু করতে না পারলে তায়াম্মুম করে। এই নামায কোনো অবস্থায়ই মাফ নেই। কারণ নামায হল 'মাকসূদ বিয-যাত' এবং প্রথম স্তরের ইবাদত; পক্ষান্তরে ডাক্তার সাহেবের রুগীর চিকিৎসা ইবাদতে মাকসূদা নয়; তা দ্বিতীয় পর্যায়ের ইবাদতে গাইরে মাকসূদা। সুতরাং দুই প্রকারের ইবাদতে মোকাবেলা হলে, প্রথম প্রকারকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। ডাক্তার সাহেব এই পার্থক্য না বোঝার কারণে, নামায বাদ দিয়ে রুগীর সেবাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। এটা মারাত্মক ভুল।

অন্যান্য কাজ অপেক্ষা নামাযের গুরুত্ব অনেক বেশি

দেখুন! আপনি যখন ক্লিনিকে রুগীর সেবা করেন, তখন কিন্তু বিভিন্ন প্রয়োজনে সময় বের করে তা পূরণ করেন। যেমন টয়লেটে যাওয়া,

খাবারের সময় খাবার গ্রহণ করা কিংবা কোনো মেহমান আসলে তার সঙ্গ দেয়া ইত্যাদি। এ সময় আপনি রুগীর সেবা বন্ধ রেখেই বের হয়ে যান। এগুলোর জন্য যদি সময় বের করতে পারেন, তো নামাযের জন্য সময় বের করতে সমস্যা কোথায়? এতে আপনার খেদমতে খালক ব্যাহত হবে কেন? নামায উপরোক্ত সবগুলো কাজ থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমল। বস্তুত আমাদের কাজগুলোর কোনটার মর্যাদা ও গুরুত্ব কতটুকু? তা না জানার কারণেই আমরা এই বিভ্রান্তির শিকার হই। নেক নিয়তে সুন্নত তরীকায় কাজ করলে তো একজন মুমিনের সকল কাজই ইবাদত হিসাবে গণ্য হতে পারে, কিন্তু এগুলো হবে দ্বিতীয় স্তরের ইবাদত। এগুলো কখনো প্রথম স্তরের ইবাদত; নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও যিকির ইত্যাদির সমপর্যায়ে উত্তীর্ণ হবে না। এগুলো প্রথম স্তরের ইবাদত এবং বান্দাকে আল্লাহ এগুলোর জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

মানুষের পরীক্ষা

মানুষকে আল্লাহ পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই মূলত এ জাতীয় ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ দেখতে চান, মানুষ দুনিয়ার বিভিন্ন প্রয়োজন, তার নফসের চাহিদা ইত্যাদির বেষ্টনিতে থেকেও আল্লাহর ইবাদত করে কি

না? আল্লাহর মুহাব্বত ও ভালোবাসার টানে সবকিছুর আকর্ষণকে পদদলিত করেও সে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় কি না?

সার্বক্ষণিক ইবাদতের হুকুম হলেও জুলুম হত না

এ কথা যখন সাব্যস্ত হল যে, মানুষের সৃষ্টি ও তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত, সুতরাং আল্লাহ যদি আমাদেরকে হুকুম করতেন, তোমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাক্ষণ আমার ইবাদতে রত থাকবে; আমার কদমে সেজদাবনত থাকবে; মানবিক প্রয়োজনের তাগিদে বেঁচে থাকার জন্য শুধু দুই বেলা খাবারের বিরতি পাবে, তাহলে কি তাঁর এই নির্দেশ অন্যায় হত? কস্মিনকালেও নয়। কারণ আমাদেরকে তো সৃষ্টিই করা হয়েছে তাঁর ইবাদতের জন্য।

আমরা বিক্রিত 'পণ্য'

একদিকে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিই করেছেন ইবাদতের জন্য; অপরদিকে তিনি ইরশাদ করেন

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

'আল্লাহ মুমিনদের জান এবং মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।'

সুতরাং আমি আর আপনি তো বিক্রিত পণ্য। আমাদের জানও বিক্রি হয়ে গেছে; মালও বিক্রি হয়ে গেছে। এখন যিনি আসমান জমিন সম জান্নাতের মতো অমূল্য বিনিময় দিয়ে আমাদের তুচ্ছ জান মাল কিনে নিলেন, তিনি যদি বলেন, তোমাদের এখন শুধু জান বাঁচানো পরিমাণ পানাহার ব্যতীত অন্য কোনো কাজের অনুমতি নেই; শুধু আমার সেজদায় পড়ে থাকবে, তবে এ অধিকার তাঁর অবশ্যই আছে। এতে আমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম হবে বলার সুযোগ নেই। কিন্তু তিনি বড় অদ্ভুত খরিদদার! একে তো এমন তুচ্ছ পণ্যের মূল্য দিলেন এত চড়া! যার সঙ্গে বিনিময়ের কোনো তুলনা চলে না। আবার বলে দিলেন, আমি এত চড়া মূল্যে তোমাদের যেই জান মাল খরিদ করলাম, তা তোমাদেরই ফিরিয়ে দিলাম। তা দিয়ে তোমরা উপকৃত হও। আজীবন তা ভোগ কর। চাকরি বাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য, পানাহার এমনকি বৈধ যে কোনো চাহিদা পূরণ কর, কোনো আপত্তি নেই। শুধু দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত আমার কাছে একটু হাজির হও; সামান্য ইবাদত কর এবং এর বাইরে সামান্য বিধি নিষেধ মেনে চল। এছাড়া সবকিছু তোমাদের ইচ্ছামতো কর, তাতেই তোমরা আরামসে জান্নাতের মতো চড়ামূল্যের অধিকারী হয়ে যাবে।

মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে গেছে

আল্লাহ মানুষকে তার জান মাল ফিরিয়ে দিলেন। তার জন্য ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বাকরি, ক্ষেত খামার সবকিছুর অনুমতি দিয়ে দিলেন। অনুমতি পেয়ে যখন মানুষ এসব কাজে লেগে পড়ল, তখন সে একদমই ভুলে বসল, আমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং কেনই বা আমাকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে? আমার জীবনের উদ্দেশ্য আসলে কি? কে আমাকে খরিদ করলেন? কেন করলেন? তিনি আমাদের কি হুকুম করেছেন? সব সে ভুলে বসেছে। এখন খুব ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে; খুব উপার্জন হচ্ছে; দিন রাত এখন দুনিয়ার পিছনেই ব্যয় হচ্ছে; দুনিয়ার ধান্দায় দেধারসে প্রতিযোগিতা চলছে । কখনো নামাযের চিন্তা হয়ও যদি, তা হয় শুধু শরীরের নামায; অঙ্গভঙ্গির নামায। মসজিদে উপস্থিত হল ঠিক; কিন্তু দিল ব্যবসায় রেখে আসল। কোনোরকম তাড়াহুড়ো কয়েকটি সেজদা করল, আবার এসে ব্যবসায় লেগে গেল ব্যস। কখনো মসজিদে আসার সুযোগ হল

না, তো ঘরেই পড়ে নিল, কিংবা কখনো অতি ব্যস্ততায় না-ই পড়ল তাতে তেমন কিছু যায় আসে না। এভাবে দুনিয়া ও দুনিয়ার সহায় সম্পদ এবং বস্তুবাদী চিন্তা চেতনার প্রভাব মানুষকে গ্রাস করে ফেলল এবং সে তার জীবনের লক্ষ্য বেমালুম ভুলেই গেল।

ইবাদতের বৈশিষ্ট্য

ইবাদতের বৈশিষ্ট্য হল, আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক গড়া। যত ইবাদত করবে, ততই আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক মজবুত হবে এবং ধীরে ধীরে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হতে থাকবে।

দুনিয়াবী কাজের বৈশিষ্ট্য

পক্ষান্তরে দুনিয়ার কাজের বৈশিষ্ট্য হল, মানুষ যদি তা সঠিকভাবে সুন্নত তরীকায় আল্লাহর হুকুম মোতাবেকও করে, তবুও তা তাকে ধীরে ধীরে গোনাহের দিকে আকর্ষণ করে এবং তাকে রুহানিয়াত ও নূরানিয়াত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

একজন মানুষ যখন দীর্ঘ এগার মাস দুনিয়ার কাজে বেশি ব্যস্ত থাকে; টাকা পয়সা ও ধন সম্পদ উপার্জনে তার দৃষ্টি নিবিষ্ট থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে বস্তুবাদী চিন্তা চেতনা প্রভাব বিস্তার করে। ফলে আল্লাহর সঙ্গে তার যেই সম্পর্ক থাকা দরকার ছিল, তা আর থাকে না; দুর্বল হয়ে যায়। তার দিলের রুহানিয়াত ও নূরানিয়াত নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

রহমতের বিশেষ মাস

আল্লাহ মানুষের খালিক ও মালিক। তিনি জানেন, বান্দা যখন দুনিয়ার পিছনে লেগে যাবে, আমাকে ভুলে যাবে। আমার ইবাদতের প্রতি এই পরিমাণ মনোযোগ থাকবে না, যেই পরিমাণ দুনিয়ার প্রতি থাকবে। এজন্য আল্লহ বলছেন, হে আমার বান্দা! এগার মাসের গাফলতে তুমি যখন আমাকে ভুলতে বসেছ, আমি এবার তোমাকে বিশেষ রহমতের একটি মাস দিচ্ছি এবং প্রতি বছর দিব। যেখানে তুমি অল্প চেষ্টা করেই এগার মাসের ক্ষতিপূরণ করতে পারবে। আমার সঙ্গে তোমার হারানো সম্পর্ক উদ্ধার করে আবার তা মজবুত করতে পারবে। তোমার অন্তরে যেই ঝং ধরেছে তা পরিষ্কার করে নিতে পারবে। এবার তোমার অন্তরের গাফলত দূর করে আমার যিকির দিয়ে অন্তর আবাদ করে নাও।

এসব উদ্দেশ্য সাধনে রমযান মাসের রোযা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রোযা ব্যতীত যত আমল আছে এই রমযান মাসে, সবগুলোই আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিশেষ বিশেষ উপাদান। এগুলো দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য হল, দূরে চলে যাওয়া বান্দাকে আবার তাঁর নৈকট্য লাভের সুযোগ দান করা।

এবার নৈকট্য অর্জন করে নাও

ইরশাদ হচ্ছে

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ﴿﴾

"হে ঈমানদারেরা! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া ও খোদাভীতি অর্জন করতে পার।"

দীর্ঘ এগার মাস তোমরা যেসব কাজে বেশি ব্যস্ত ছিলে, তা তোমাদের তাকওয়া তাহারাতকে দুর্বল করে দিয়েছে। এবার রোযা রেখে তোমাদের তাকওয়াকে শক্তিশালী করে নাও। বোঝা গেল, শুধু রোযা রাখা আর তারাবী পড়াই যথেষ্ট নয়; বরং পুরো রমযান মাসকে তাকওয়া অর্জনের টার্গেট করে তা থেকে কাঙ্খিত ফল লাভ করা হল মূল বিষয়। এগার মাসের ব্যবধানে জীবনের আসল উদ্দেশ্যইবাদত বন্দেগী থেকে যেই দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তা কাটিয়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে হবে। এটা অর্জনের পদ্ধতি হল, আগে থেকেই রমযান মাসকে দুনিয়াবী কাজকর্ম থেকে ইবাদত বন্দেগীর জন্য ফারেগ করতে হবে। অন্যান্য কাজের ধান্দা তো দীর্ঘ এগার মাস চালিয়েছ; একটি মাসের জন্য সেগুলো যতদূর সম্ভব কমিয়ে নাও। একটি মাস ভালো করে আল্লাহর ইবাদতে কাটাবার চেষ্টা কর।

রমযানের অভ্যর্থনা

আমার আব্বাজান হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. বলতেন, রমযানের প্রস্তুতি ও অভ্যর্থনা হল, বান্দা আগে থেকেই চিন্তা করে ঠিক করবে, তার দুনিয়াবী কাজকর্ম; যথা ব্যবসা বাণিজ্য, ক্ষেত খামার ইত্যাদির কি কি কাজ বন্ধ রাখা যায় বা পিছিয়ে দেয়া যায়। তারপর যেই সময়টুকু বের করা গেল, সেই সময়গুলো ইবাদত বন্দেগীতে কাটাবে।

বার্ষিক ছুটি রমযান মাসে কেন?

আমাদের দ্বীনি মাদরাসাগুলোতে বহুকালের প্রচলন এখানে বার্ষিক ছুটি হয় রমযান মাসে। ১৫ই শা 'বান শিক্ষাবর্ষ শেষ হয়ে ১৫ই শাওয়াল পর্যন্ত দুই মাসের ছুটি থাকে। শাওয়াল থেকে আবার নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। এটা আমাদের বুযুর্গদের চালু করা নিয়ম। এ সম্পর্কে মানুষ আপত্তি করে দেখ! মৌলভি সাহেবরা তাদের কর্মপন্থার মাধ্যমে মানুষকে একথার দাওয়াত দিতে চায় যে, রমযানে বেকার থাকা চাই। অথচ সাহাবায়ে কেরাম তো রমযান মাসে জিহাদ পর্যন্ত করেছেন। অন্যান্য কাজ তো করেছেনই।

খুব ভালো করে বুঝুন! জিহাদের প্রয়োজন হলে তো অবশ্যই রমযান মাসে জিহাদও করতে হবে। যেমন বদর যুদ্ধ এবং ফাত্হে মক্কার অভিযান রমযান মাসেই হয়েছিল। কিন্তু বছরের কোনো মাসে যদি ছুটি হতে হয় তবে তাও হতে হবে রমযান মাসেই। যাতে এই মাসে অধিক থেকে অধিকতর সময় আল্লাহর ইবাদতের জন্য ফারেগ করা যায়।

আমাদের দ্বীনি মাদরাসাগুলোতে সারা বছর যা হয়, তাও ইবাদত। কারণ কুরআন হাদীস ও ফিক্হসহ দ্বীনের অন্যান্য যত তালীম এখানে হয়, সবই তো ইবাদত। কিন্তু এগুলো পরোক্ষ ও দ্বিতীয় স্তরের ইবাদত। আল্লাহ চান, বান্দা রমযান মাসকে প্রথম স্তরের প্রত্যক্ষ ইবাদতের জন্য খাস করে নিক। এজন্য আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গানে দ্বীন বার্ষিক ছুটির সময় গ্রীষ্মের পরিবর্তে রমযান মাসকে নির্ধারিত করেছেন। যাতে এই মাসকে অধিকতর প্রথম স্তরের ইবাদতে কাটানো যায়। এটাই হল রমযানে বার্ষিক ছুটি কাটানোর তাৎপর্য।

সুতরাং যাদের রমযানে অন্যান্য কাজ থেকে ছুটি কাটানোর সুযোগ আছে, তারা রমযানেই ছুটি কাটাবে। বাকি যাদের সুযোগ নেই, তারাও যতদূর সম্ভব সময়কে এমনভাবে রুটিনবদ্ধ করে নিবে, যাতে অধিকতর সময় ইবাদতে মাকসূদায় অতিবাহিত হয়। এটাই রমযানের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

রাসূল সা.কে ইবাদতে মাকসূদার নির্দেশ

আমার আব্বাজান রহ. বলেন, দেখ! আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ۝ وَ اِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

'আপনি যখন (অন্যান্য কাজ থেকে) ফারেগ হন, তখন (আল্লাহর ইবাদত করতে করতে) ক্লান্ত হয়ে পড়-ন এবং আল্লাহর প্রতি আগ্রহী হন।'

দেখুন! আল্লাহ কোন্ কাজ করে ক্লান্ত হতে বলেছেন? নামায আদায় করে; আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থেকে এবং তাঁকে সেজদা করে ক্লান্ত হতে বলেছেন। আব্বাজান রহ. বলতেন, একটু চিন্তা করে দেখুন! এই সম্বোধন কাকে করা হচ্ছে? খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করা হচ্ছে। আপনি যখন ফরেগ হন, আল্লাহর ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ করুন এবং ইবাদত করতে করতে ক্লান্ত হন। চিন্তার বিষয়! রাসূল কি কাজগুলো করতেন, যেগুলো থেকে ফারেগ হওয়ার পর ইবাদতে রত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে? তিনি কি দুনিয়াবী কাজে লেগে থাকতেন? কস্মিনকালেও নয়। তাঁর তো প্রতিটি কাজই ইবাদত ছিল। হয় তিনি তালীমে রত, না হয় তাবলীগে ব্যস্ত, না হয় জিহাদে মগ্ন কিংবা কারো তারবিয়তে। দ্বীনের খেদমত ব্যতীত তাঁর কোনো কাজই ছিল না। কিন্তু তথাপিও তাঁকে বলা হচ্ছে, আপনি যখন এসব কাজ থেকে ফারেগ হবেন, তখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যান। এই হুকুম পালন করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত এমনভাবে নামাযে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতেন, যাতে তাঁর পা মুবারাক ফুলে যেত। এখান থেকে বোঝা গেল, অন্যান্য যে কাজগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন, সেগুলো ছিল দ্বিতীয় স্তরের পরোক্ষ ইবাদত এবং তা থেকে ফারেগ হওয়ার পর যেই ইবাদতে রত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন, তা হল প্রথম স্তরের ইবাদতে মাকসূদা।

মৌলভি সাহেবের শয়তানও মৌলভি

আমার আব্বাজান রহ. বলতেন, মৌলভি সাহেবের শয়তানও মৌলভি হয়। এজন্য শয়তান মৌলভিদেরকে ইলমীভাবে ধোঁকা দেয়। শয়তান মৌলভি সাহেবকে বলে, এই যে বলা হয়; এগার মাস দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত ছিলে সুতরাং রমযান মাসে একটু আল্লাহমুখী হওয়া দরকার, তা তো যারা ব্যবসা বাণিজ্য, ক্ষেত খামার, চাকরি বাকরি কিংবা দুনিয়া কামানোর জন্য বিভিন্ন কর্ম-পেশায় জড়িত ছিল তাদের জন্য। তুমি তো সারা বছরই আল্লাহর ইবাদতে দ্বীনের খেদমতে কাটিয়েছ। তালীম, তাদরীস, তাবলীগ, ওয়াজ নসিহত ও ফিক্হ ফতোয়া ইত্যাদির মতো বড় বড় দ্বীনের কাজেই রত ছিলে! বস্তুত এটা শয়তানের ধোঁকা। কারণ এগার মাস তুমি যা করেছ, তা ইবাদত হলেও দ্বিতীয় স্তরের পরোক্ষ ইবাদত ছিল। রমযান মাস তো আল্লাহ দিয়েছেন প্রথম স্তরের প্রত্যক্ষ ইবাদতের জন্য। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে বোঝার এবং রমযান মাসকে যথাযথ কাজে লাগানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

নৈকট্যের চল্লিশ স্তর পার করুন

এবার একটি রুটিন তৈরি করে নিন, কিভাবে রমযান মাস অতিবাহিত করবেন। যেই কাজগুলো পিছানো যায় পিছিয়ে দিন। ঠিক মতো রোযা রাখুন; তারাবী পড়-ন। তারাবী সম্পর্কে হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. বড় মজার কথা বলতেন। তিনি বলতেন, তারাবী বড় আজব বিষয়। এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রতিদিন বান্দাকে অন্যান্য দিন অপেক্ষা অনেক বেশি নৈকট্য দান করেন। তারবীর বিশ রাকাতে মোট চল্লিশটি সেজদা করা হয়। প্রতিটি সেজদায় আল্লাহর এমন সুউচ্চ মাকাম ও নৈকট্য লাভ হয়, যার চেয়ে উচ্চ মাকাম আর হতে পারে না। মানুষ যখন আল্লাহর সামনে সেজদা করে এবং নিজের সম্মানিত কপাল জমিনে ঠেকিয়ে দেয়; যবানে তার উচ্চারিত হয়

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلٰى

তা এমন এক সুউচ্চ মাকাম ও মর্যাদা হিসাবে আল্লাহ গ্রহণ করেন, যার চেয়ে উচ্চ মাকাম ও মর্যাদা বান্দা অন্য কোনোভাবে অর্জন করতে পারে না।

একজন মুমিনের মে’ রাজ

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে ‘রাজ থেকে উম্মতের জন্য এই নৈকট্যই অর্জন করেছেন। তিনি যখন দেখলেন, আল্লাহ মে ‘রাজে তাঁকে এত উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, ভাবলেন উম্মতের জন্য কি উপহার নিয়ে যাব? তখন আল্লাহ বললেন, আপনার উম্মতের জন্য সেজদা নিয়ে যান। তার জন্য প্রতিটি সেজদাই মে ‘রাজ। এজন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ

অর্থাৎ কোনো মুমিন যখন আল্লাহর দরবারে তার কপাল রেখে দেয়, তখনই তার মে ‘রাজ হয়ে যায়। এই সেজদায় আল্লাহর পরম নৈকট্য লাভ হয়।

সেজদায় আল্লাহর নৈকট্য

সূরা ইক্বরায়ে আল্লাহ কত চমৎকার বলেছেন

وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ ۩

‘সেজদা কর এবং আমার নিকটে চলে আস।’

(এটি সেজদার আয়াত; সবাই সেজদা করে নিবেন।)

বোঝা গেল, প্রতিটি সেজদাই আল্লাহর নৈকট্যের মর্যাদা রাখে। রমযান মাসে আল্লাহ আমাদের জন্য সেই রকম অতিরিক্ত চল্লিশটি সেজদার সুযোগ করে দিয়েছেন। যার অর্থ দাঁড়ায়, প্রত্যেক বান্দাকে আল্লাহ দৈনিক তাঁর নৈকট্যের চল্লিশটি স্তর অতিক্রম করান। এর কারণ সেই দূরত্ব কাটিয়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়া, যা দীর্ঘ এগার মাসে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝে তৈরি হয়েছে। সুতরাং তারবীর নামাযকে কোনো মামুলি বিষয় মনে করার সুযোগ নেই।

কেউ কেউ বলে, আমরা তো আট রাকাত তারাবী পড়ব; বিশ রাকাত পড়ব না। এর অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ বলছেন, আমি তোমাকে নৈকট্য ও উন্নতির চল্লিশটি মাকাম দান করব, কিন্তু বান্দা বলছে না; আমার তো ষোল মাকামই যথেষ্ট; চল্লিশের প্রয়োজন নেই। বস্তুত তারা এই মাকাম ও মর্যাদার মূল্য ও গুরুত্ব বোঝেনি, এজন্যই তারা এমন কথা বলে।

অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করুন

সারকথা হল, রমযান মাসে রোযা তো রাখতেই হবে এবং তারবীও পড়তে হবে। পাশাপাশি যতটুকু সময় পাওয়া যায়, পুরো সময়টাই ইবাদত বন্দেতগীতে কাটানোর চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে অধিক পরিমাণে তিলাওয়াতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। কারণ রমযান মাসের সঙ্গে কুরআনে কারীমের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য এই মাসে বেশি বেশি তিলাওয়াত করতে হবে। হযরত ইমাম আবু হানীফ রহ. রমযানে প্রতিদিন, রাতে এক খতম; দিনে এক খতম এবং তারাবীতে এক খতম কুরাআন তিলাওয়াত করতেন। এভাবে পুরো রমযানে ৬১খতম তিলাওয়াত করতেন। আল্লামা শামী রহ. প্রতিদিন এক খতম তিলাওয়াত করতেন। বড় বড় বুযুর্গানে দ্বীন এভাবেই রমযান মাসে বেশি বেশি তিলাওয়াতে অভ্যস্ত ছিলেন। আমাদেরও রমযান মাসে অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি পরিমাণে তিলাওয়াত করা উচিত।

অধিক পরিমাণ নফল আমল করুন

অন্যান্য সময় যে নফল নামাযগুলো আদায় করার সুযোগ হয় না, রমযান মাসে সেগুলো আদায় করা চাই। সারা বছর তাহাজ্জুদ পড়ার সুযোগ হয় না, কিন্তু রমযান মাসে তাহাজ্জুদের সময় সাহরির জন্য এমনিতেই উঠতে হয়। খেয়াল করে একটু আগে উঠে পড়-ন এবং যতটুকু সম্ভব তাহাজ্জুদ আদায় করে নিন। তাছাড়া এশরাক, আউয়াবীন, চাশত ইত্যাদি নফলগুলো অন্যান্য সময় আদায় করতে না পারলেও রমযানে অন্তত আদায় করার চেষ্টা করুন।

অধিক পরিমাণে দান সদকা করুন

রমযান মাসে যাকাত ছাড়াও নফল দান সদকা বেশি বেশি করার চেষ্টা করুন। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদান্যতা ও দানশীলতার মহাসমুদ্রে এমনিতে তো সারা বছরই উত্তাল ঢেউ থাকত, রমযানে তা রীতিমতো ঝড় ঝঞ্ঝার বেগে প্রবাহিত হত।

যে-ই তাঁর কাছে চাইত, তাকেই তিনি অকাতরে দান করতেন। সুতরাং আমাদেরও এ মাসে বেশি বেশি দান সদকা করা চাই।

অধিক পরিমাণে যিকির করুন

তাছাড়া চলা ফেরা, উঠা বসা সর্বাবস্থায় বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করুন। হাতে কাজ করুন, কিন্তু যবানে যিকির জারি রাখুন। সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আজীম, লাহাওলা

ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ইত্যাদি পড়তে থাকুন। দরুদ শরীফ ও ইস্তেগফার বেশি বেশি পড়-ন। এছাড়াও যখন যেই যিকির যবানে আসে চালু রাখুন।

গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন

রমযান মাসে বিশেষ করে সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন। এখনই সংকল্প করুন, রমযান মাসে এই চক্ষুদ্বয় ইনশাআল্লাহ অপাত্রে ব্যবহৃত হবে না। এই যবান থেকে মিথ্যা, গীবত কিংবা কাউকে কষ্ট দেয়ার মতো কোনো বাক্য উচ্চারিত হবে না। রমযানের জন্য যবানে তালা লাগিয়ে দিন। এটা কেমন কথা যে, রোযা রেখে হালাল খাবার পরিহার করছ, কিন্তু অপর ভাইয়ের মৃতদেহের গোশত ভক্ষণ করছ! গীবত করাকে তো কুরআনে কারীমে ভাইয়ের মৃতদেহের গোশত খাওয়ারই নামান্তর বলা হয়েছে।

সুতরাং গীবত থেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। অনর্থক কাজ; অনর্থক গল্প গুজব ও আড্ডাবাজি পরিহার করে চলতে হবে।

অধিক পরিমাণে দু 'আ করুন

তাছাড়া এ মাসে আল্লাহর দরবারে খুব বেশি বেশি দু 'আ করুন। রহমতের দরজা সার্বক্ষণিক খোলা। মুষলধারে রহমতের বারি বর্ষিত হয়ে চলেছে। মাগফিরাতের বাহানা তালাশ করা হচ্ছে। আল্লাহর পক্ষ হতে আহ্বান করা হচ্ছে, আছো কেউ দু 'আপ্রার্থী! আসো তোমার দু 'আ কবুল করা হবে। সুতরাং সকাল কি সন্ধ্যা, দুপুর কি রাত সর্বদাই তাঁর নিকট প্রর্থনা করে যাও। তিনি বলছেন, ইফতারের সময় চাও; আমি কবুল করব, রাতে চাও; কবুল করব, রোযা অবস্থায় চাও; কবুল করব, শেষরাতে চাও; কবুল করব; কখনো ফিরিয়ে দেব না। আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন, সর্বদা তোমাদের দু 'আ কবুলের দরজা উম্মুক্ত। সুতরাং তোমরা খুব বেশি বেশি দু 'আ করতে থাক।

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, এটা তো দু 'আর মাস। এজন্য তাঁর নিয়ম ছিল, আসরের পর থেকে মাগরীব পর্যন্ত তিনি মসজিদেই বসা থাকতেন। কখনো কিছু তিলাওয়াত করলেন, বা কিছু তাসবীহ তাহলীল পড়লেন কিংবা মুনাজাতে মাকবুল পড়লেন; তারপর থেকে মাগরীব পর্যন্ত পুরো সময় দু 'আ করে কাটাতেন। খুব বেশি পরিমাণে দু 'আ করতেন। আপনাদেরও যতটুকু সম্ভব, বেশি করে আল্লাহর নিকট দু 'আ করার চেষ্টা করুন। নিজের জন্য, নিজের আত্মীয় স্বজনের জন্য এবং বন্ধু বান্ধব ও পাড়া প্রতিবেশীর জন্য, দেশ ও জাতির জন্য; বিশেষত মুসলিম বিশে^র জন্য দু 'আ করতে থাকুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে মেহেরবানী করে এই কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। রমযান মাসের মূল্যায়ন করে সময়গুলো ঠিকমতো কাজে লাগানোর তাওফীক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত (১০/৬১-৮২), বাদ আসর,

বাইতুল মুকাররাম মসজিদ, করাচী

রমযানের জন্য নেক কাজ বিলম্বিত করা

اَ لْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَ عَلٰى اٰلِه

وَ أَصْحَابِه

• أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ!

আলহামদুলিল্লাহ! কিবির ও আত্মম্ভরিতা সম্পর্কে হযরত থানভী রহ.-এর যেসব বাণী ছিল, সেগুলোর প্রয়োজন পরিমাণ আলোচনা পূর্ণ হয়েছে। রমযানের আর একদিনমাত্র বাকি। রমযান সম্পর্কে হযরতের একটি বাণী আছে। ইচ্ছা করেছি আজ সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বাণী।

হযরত বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে নেক কাজ বিলম্বিত করা কাম্য নয়; বরং নেক ও কল্যাণের কাজ প্রতিযোগিতামূলক আগে আগে সম্পাদন করা কাম্য। এজন্য কুরআনের কোথাও বলা হয়েছে

فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرٰتِ ۧ

'কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা কর।'

কোথাও বলা হয়েছে

وَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ

'এবং তারা কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা করে।'

তাছাড়া হদীসেও যে রমযান মাসে অধিক সওয়াবের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা রমযানে অধিক পরিমাণ আমল করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে; রমযান পর্যন্ত আমল বিলম্বিত করার কথা বলা হয়নি। সুতরাং ২৮শে শা' বান যদি কারো যাকাতবর্ষ পূর্ণ হয়, তাহলে রমযানে অধিক সওয়াব অর্জনের আশায়; যাকাত আদায়ে বিলম্ব করা কাম্য নয়। 'শারে' বা শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য আদৌ এমন নয়। এমন করা 'শারে' ও শরীয়তের 'মানশা' না বোঝার নিদর্শন। আরে ভাই তুমি অতি সওয়াবের আশায় বিলম্ব করছ, অথচ গরীব বেচারা তো প্রতি মুহূর্তে জান বের হওয়ার প্রহর গুনছে।

তাছাড়া রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করে আমল করলে যদিও সওয়াবের পরিমাণ বেশি হয়, কিন্তু আগে আগে সময়মতো আমল করার দ্বারা সওয়াবের পরিমাণ বেশি না হলেও মান বেশি হয়। আর শরীয়তে আমলের পরিমাণের চেয়ে মানই অধিক কাম্য। উলামায়ে কেরামের বক্তব্যে এর অসংখ্য নজির রয়েছে।

যেমন হাদীসে এসেছে, মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করলে পঁচিশ গুণ সওয়াব পাওয়া যায়; জামে মসজিদে আদায় করলে পাঁচশত গুণ। কিন্তু তাই বলে মহল্লাবাসীর জন্য মহল্লার মসজিদ ছেড়ে জামে মসজিদে নামায আদায় করা জায়েয নেই। করলে গোনাহগার হবে।

কারণ তার জন্য জামে মসজিদে নামায আদায়ের সওয়াব পরিমাণে বেশি হলেও মানে কম। পক্ষান্তরে মহল্লার মসজিদে নামাযের সওয়াব পরিমাণে কম হলেও মানে বেশি। কারণ মহল্লার মসজিদ আবাদ রাখা তার উপর ওয়াজিব। সুতরাং এখানে নামায আদায় করলে, নামাযের পাশাপাশি মসজিদ আবাদ রাখার ওয়াজিব আদায়ের সওয়াবও হাসিল হবে, যা জামে মসজিদে আদায় করলে হবে না। কারণ তা আবাদ করা তার উপর ওয়াজিব নয়; তা জামে মসজিদের মহল্লাবাসীর উপর ওয়াজিব।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল, রমযান পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, গরিবের প্রয়োজনের মুহূর্তে আপনি তার যেই উপকার করলেন, তাতে হতে পারে আপনি তার এমন দু 'আ পেয়ে যাবেন, যা অন্য সময় পাবেন না। তাছাড়া আপনি যে রমযান পর্যন্ত জীবিত থাকবেন, তারই বা কি গ্যারান্টি আছে। বলতে পারেন আমি রমযানে দান করার অসিয়ত করে যাব। কিন্তু মনে রাখবেন, অসিয়তের দানের সওয়াব, কখনো নিজ হাতে দানের সওয়াবের সমকক্ষ হতে পারে না। তাছাড়া তারা যে আপনার অসিয়ত যথাযথ আদায় করবে, তারই বা কি নিশ্চয়তা আছে।

একটি ভুল

আলোচ্য বাণীটিতে হযরত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি আলোচনা করেছেন। যা না জানার কারণে অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। অনেক লোককে দেখা যায়, তাদের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে গেছে, কিন্তু তারা যাকাত আদায় না করে রমযানের অপেক্ষায় বসে আছে। কিংবা কিছু দান সদকা করার ইচ্ছা আছে, কিন্তু তার জন্যও সে রমযান মাসের অপেক্ষা করছে। কারণ হাদীসে এসেছে, রমযান মাসে একটি নফল আদায় করলে একটি ফরযের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়; এবং একটি ফরয আদায় করলে সত্তরটি ফরযের সওয়াব পাওয়া যায়। এই হাদীসের কারণে মানুষ যাকাত ও দান সদকা মওকুফ করে রমযানের অপেক্ষায় বসে থাকে। অথচ হাদীসের উদ্দেশ্য এটা নয়।

হাদীসের উদ্দেশ্য

হযরত ছোট্ট দুটি বাক্যে হাদীসের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। 'হাদীসের উদ্দেশ্য, রমযানে নগদ আমল করা; রমযানের জন্য আমল বিলম্বিত করা নয়।' অর্থাৎ হাদীসের উদ্দেশ্য হল, রমযানে যেহেতু আমলের সওয়াব এত বেশি সুতরাং কোনো আমলের কথা দিলে আসলে ততক্ষণাৎ তা করে নাও এবং রমযান মাসে তালাশ করে করে বেশি বেশি সওয়াবের কাজ আঞ্জাম দাও। হাদীসের উদ্দেশ্য আদৌ এটা নয় যে, রমযানের আগে কোনো নেক কাজের সুযোগ আসলেও তা না করে অধিক সওয়াবের আশায় রমযান পর্যন্ত বিলম্বিত কর।

সুতরাং যখনই যেই নেক কাজের সুযোগ হয়; চাই তা ফরয হোক বা নফল, সঙ্গে সঙ্গে আদায় করে নাও; বিলম্ব করো না।

নেক কাজ আগে আগে করাই কাম্য

হযরত দলীল হিসাবে বলেছেন, কুরআনে কারীমের কয়েক জায়গায় নির্দেশ এসেছে

فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرٰتِ ؕ

‘কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা কর।’

অন্যত্র এসেছে

وَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ط

‘এবং তারা কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা করে।’

দৌড়ে দৌড়ে জান্নাতি আমলের দিকে যাও এবং দ্রুত কর; বিলম্ব করো না। সুতরাং কুরআনে কারীম আমাদেরকে আগে আগে নেক কাজ সম্পাদন করার নির্দেশ দিচ্ছে, কিন্তু আমরা অপেক্ষায় আছি, কখন রমযান আসবে, তখন আমল করব। তা কুরআন সুন্নাহর নির্দেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

যাকাত কখন ওয়াজিব হয়?

বিশেষত যাকাত সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা বেশি। সবার এক কথা যাকাত আমরা রমযান মাসেই আদায় করব, এমনকি ছয় মাস আগেও যদি ওয়াজিব হয়, তবুও। খুব ভালো করে বুঝে নিন, প্রত্যেক ব্যক্তি যেই তারিখে প্রথম নেসাবের মালিক হয়, পরবর্তী বছরের ঠিক সেই তারিখেই তার উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। যেমন কেউ যদি রবিউল আউয়ালের এক তারিখ নেসাব পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদের মালিক হয়, তাহলে পরবর্তী বছরের পহেলা রবিউল আউয়াল তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয হবে এবং প্রতি বছর এই তারিখেই তাকে যাকাতের হিসাব বের করে যাকাত আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে সে যদি পহেলা রমযান যাকাতের হিসাব করে তবে তা হবে ভুল।

যাকাতের হিসাবে ভুল

কিন্তু আজকাল মানুষ অনেক বেশি পরিমাণে দুটি ভুল করে। অনেক মানুষ যাকাতবর্ষের হিসাবে ভুল করে। যেমন যাকাতবর্ষ শুরু হয়েছে ১লা রবিউল আউয়াল, কিন্তু সে নিজ থেকে হিসাব শুরু করেছে পহেলা রমযান। ফলে তার যাকাতের পূর্ণ হিসাবই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ যেদিন আপনার যাকাতের হিসাব করা প্রয়োজন ছিল, সেদিন তা না করে আপনি যাকাতের সম্পদে বিভিন্ন ধরনের তাসরুফ করেছেন। এখন কয়েক মাস পর যখন হিসাব করছেন, তখন যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, আপনার যকাতযোগ্য সম্পদের বড় একটি অংশ খরচ হয়ে গেছে, যার যাকাত আপনি আদায় করেননি।

একটি দৃষ্টান্ত

ধরুন পহেলা রবিউল আউয়াল আপনার যাকাতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। তখন আপনার নিকট এক লক্ষ টাকা ছিল। হিসাবমতে আপনার উপর যাকাত বাবদ আড়াই হাজার টাকা ওয়াজিব হয়েছে। কিন্তু এদিন আপনি যাকাতের হিসাব করলেন না। হিসাব করলেন পহেলা রমযান, যখন আপনার এক লক্ষ টাকার পঞ্চাশ হাজার খরচ হয়ে গেছে। এখন আপনি মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকার যাকাত ১২৫০ টাকা আদায় করছেন। অথচ যাকাতবর্ষ পূর্ণ হওয়ায় আপনার উপর খরচকৃত পঞ্চাশ হাজার টাকারও যাকাত আদায় করা ওয়াজিব ছিল। তা আদায় না করে আপনি কবীরা গোনাহের শিকার হলেন। আর এ থেকে পরিত্রাণেরও সম্ভাবনা কম। কারণ আপনি তো খরচকৃত পঞ্চাশ হাজার টাকার হিসাবই রাখেননি। হিসাব রাখলে হয়তো পরবর্তীতে কখনো আদায় করার

সম্ভাবনা ছিল। এটা খুবই ভয়াবহ বিষয়। সুতরাং এথেকে বাঁচার জন্য যেই তারিখে নেসাবের মালিকানা অর্জিত হয়, সেই তারিখেই যাকাতযোগ্য সকল সম্পদের হিসাব করে রাখা জরুরি। তা না করলে অনেক বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

যাকাতের সম্পদ আটকে রাখা

অনেকে যাকাতের হিসাব হয়তো যথাসময়ে করেন, কিন্তু যথাসময়ে তা আদায় করেন না; রমযানের অপেক্ষায় নিজের কাছে রেখে দেন। যেমন রবিউল আউয়ালের এক তারিখ যাকাতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার পর, টোটাল একলক্ষ টাকার যাকাত হিসাব করে আড়াই হাজার টাকা বের করে নিলেন। রমযানে যেহেতু সওয়াব বেশি, এজন্য এখন আদায় করলেন না। হযরত থানভী রহ. তাঁর আলোচ্য বাণীতে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটাও মারাত্মক ভুল।

যাকাতের সম্পদের সঙ্গে মিসকীনের হক সম্পৃক্ত হয়ে যায়

প্রথম কথা হল, যাকাত মূলত মিসকীনের হক। যখন আপনার উপর যাকাত ফরয হয়েছে, তখন থেকেই যাকাতের সম্পদে আপনার অধিকার শেষ হয়ে গেছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে

وَ فِیْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآىِٕلِ وَ الْمَحْرُوْمِ

‘এবং তাদের সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক’

সুতরাং এটা যখন মিসকীনের হক, তো এটা তোমার উপর তার এক ধরনের ঋণ ও পাওনা হয়ে গেল। তোমার কর্তব্য হল, তা অবিলম্বে তার হাতে পৌঁছে দেয়া।

মিসকীনের অনাহার, তোমার বিলাস-চিন্তা

দ্বিতীয় কথা হল, তুমি এদিকে সত্তরগুণ সওয়াবের বিলাস-চিন্তায় বিভোর, কিন্তু তোমার এই যাকাতের হকদার বেচারা মিসকীন হয়তো অনাহারে মৃত্যুর প্রহর গুণছে। প্রাণের অস্তিত্ব তার ধুঁকে ধুঁকে ক্ষয়ে যাচ্ছে। সুতরাং যত দ্রুত সম্ভব, প্রয়োজনের মুহূর্তে তার হক তার হাতে পৌঁছে দাও।

মান ও পরিমাণের পার্থক্য

তৃতীয় কথা হযরত থানভী রহ. এটাও বলেছেন যে, হাদীসে যে রমযানে সত্তরগুণ সওয়াবের কথা বলা হয়েছে, তা তো পরিমাণের বিষয়। এখানে আরেকটি বিষয় আছেমান। অর্থাৎ অনেক সময় কোনো বস্তু সংখ্যা বা পরিমাণে হয়তো বেশি হয় না, কিন্তু তার মান কল্যাণ ও উপকারিতা অনেক বেশি হয়। আজকালের পরিভাষায় মানকে বলা হয় Quaity (কোয়ালিটি) এবং পরিমাণকে বলা হয় Quantity (কোয়ান্টিটি)। যেমন এক ব্যক্তির নিকট দশ থান কাপড় আছে; খুবই সাধারণ মানের। কিন্তু আরেক ব্যক্তির নিকট এক থান কাপড় আছে; উন্নত মখমলের। এখানে পরিমাণের দিক থেকে যদিও প্রথম ব্যক্তি এগিয়ে, কিন্তু মান ও মূল্যের দিক থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি তার চেয়ে অনেক অগ্রসর।

একটি উদাহরণ

দেখুন! একটি বিড়াল একসঙ্গে অনেকগুলো বাচ্চা দেয়, কিন্তু বাঘ একসঙ্গে মাত্র একটি বাচ্চা দেয়। বিড়াল একদিন বাঘকে সম্বোধন করে বলল, আরে কিসের তুমি বনের রাণী! সারা বছর একটিমাত্র বাচ্চা দাও। আর দেখ তো আমি বছরে প্রায় এক ডজন বাচ্চা দেই! বাঘ উত্তর দিল, আরে খালামনি! তুমি এক ডজন বাচ্চা দিলে কি হবে, সবগুলোই তো বিড়ালের বাচ্চা বিড়াল। আর আমি একটা দিলেই কি, আমার একটাই তো বাঘের বাচ্চা বাঘ। সংখ্যায় বিড়ালের বাচ্চা বেশি হলেও বাঘের বাচ্চার মান ও শক্তি তো এত বেশি যে, কয়েক ডজন কেন, কয়েক হাজার বিড়ালের বাচ্চাও তো একটা বাঘের বাচ্চার সমান হতে পারে না। কারণ মান ও কোয়ালিটি দ্বারা অনেক সময় এমন কাজ হয়, যা সংখ্যার আধিক্য দ্বারা হয় না। আপনি যে রমযানের সত্তরগুণ সওয়াব লাভের জন্য, যাকাত আদায় না করে আটকে রেখেছেন, এই সত্তর কিন্তু সংখ্যার হিসাব। এই যাকাত যদি আপনি মিসকীনের প্রয়োজনের সময় রমযানের আগে আদায় করেন, যখন সাধারণত কেউ তার অভাব পূরণে এগিয়ে আসে না, তাহলে সংখ্যায় তার সওয়াব রমযানের মতো সত্তরগুণ না হলেও সময়মতো মিসকীনের প্রয়োজন পূরণের কারণে এই সওয়াবের মান ও মর্যাদা সেই সত্তরগুণ থেকেও অনেক বেশি হতে পারে।

মহল্লার মসজিদ ছেড়ে জামে মসজিদে নামায আদায় করা

এরপর হযরত থানভী রহ. বিষয়টিকে একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করলে পঁচিশগুণ সওয়াব; জামে মসজিদে আদায় করলে পাঁচশগুণ। কিন্তু শরীয়তের হুকুম হল, মহল্লার মসজিদে নামায আদায় কর। মহল্লার মসজিদ আবাদ রাখা তোমার দায়িত্ব। কারণ তুমি মহল্লার অধিবাসী। মহল্লার সবাই যদি পাঁচশগুণ সওয়াবের জন্য জামে মসজিদে চলে যায়, মহল্লার মসজিদ তো খালি হয়ে যাবে। তখন সবাই মসজিদ অনাবাদের কারণে গোনাহগার হবে। কারণ মহল্লার মসজিদ আবাদ রাখা, মহল্লাবাসীর ফরয দায়িত্ব। সুতরাং জামে মসজিদে নামায আদায়ের সওয়াবের পরিমাণ যদিও বেশি, কিন্তু মহল্লার মসজিদে নামায আদায়ের সওয়াবের মান বেশি। এজন্য পরিমাণ ও সংখ্যাধিক্যের চক্করে পড়ে সুন্নত আমল ছেড়ে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর একটি বাক্য

হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. তাঁর আত্মজীবনিতে, হযরত শায়খুলহিন্দ রহ.-এর হৃদয়জুড়ানো একটি বাণী উল্লেখ করেছেন। হযরত বিতিরের পরের দুই রাকাত নফল বসে আদায় করতেন। অথচ হানাফী সকল ফকীহ এই দুই রাকাতও দাঁড়িয়ে আদায় করা উত্তম বলেছেন। কারণ বসে আদায় করলে অর্ধেক সওয়াব; দাঁড়িয়ে আদায় করলে দ্বিগুণ। কিন্তু হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতিরের পরের দুই রাকাত বসে আদায় করতেন। ফুকাহায়ে আহনাফ বলেন, বসে নামায আদায়ের বৈধতা বুঝানোর জন্য মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বসে আদায় করেছিলেন। কেউ হযরত শায়খুলহিন্দ রহ.কে প্রশ্ন করেছিলেন, হযরত! কিতাবে তো দাঁড়িয়ে আদায় করার সওয়াবই বেশি লেখা হয়েছে, আপনি সব সময় বসে আদায় করেন কেন? হযরত উত্তর দিলেন, ভাই কথা ঠিক আছে, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বসে আদায় করেছেন, সেভাবে আদায় করেই বেশি তৃপ্তি পাই।

আসলে অনেক ক্ষেত্রে সওয়াবের পরিমাণ কম দেখা গেলেও ঈমান ও ইহসান ইত্যাদির ফলে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সেখানে আর আমলের পরিমাণ দেখা হয় না; বরং 'কাইফিয়াত' ও রুহানিয়াত দেখা হয়। সুতরাং যখন কোনো আমল করা সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়াবে, প্রথম সুযোগেই তা করে ফেলবে; সত্তরগুণ সওয়াবের আশায় তা বিলম্বিত করা দ্বীনের সঠিক বুঝ নয়।

রমযান পর্যন্ত বাঁচার কি নিশ্চয়তা আছে?

তাছাড়া আপনি যে রমযান পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন, তার কি নিশ্চয়তা আছে আপানার কাছে? রমযানের আগেই যে আল্লাহ আপনাকে ডেকে নিবেন না, তার কোনো নিশ্চয়তা আছে? বলতে পারেন আমি অসিয়ত করে যাব, কিন্তু ওয়ারিসরা যে যথাযথ অসিয়ত পালন করবে, তারই বা কি ভরসা আছে। ততক্ষণে আপনার সম্পদও তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এজন্য ভাই! মেহেরবানী করে রমযান পর্যন্ত বিলম্বিত করার চিন্তা করবেন না। নেক কাজ সম্ভাব্য প্রথম সুযোগেই সম্পাদন করে নিন।

সময়ের তাকাযা ও দাবি পূরণের নাম দ্বীন

আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, সময়ের তাকাযা ও চাহিদা পূরণ করার নাম দ্বীন। দেখার বিষয় হল, আমার কাছে এই মুহূর্তে দ্বীন কি চায়? দ্বীন যা চায় তা-ই করে যাও। যেমন পিতা অসুস্থ। তুমি ব্যতীত দেখা শোনার কেউ নেই। পাঁচ মিনিটের জন্য ঘর ছেড়ে গেলেও বাবার কষ্ট হবে। এ অবস্থায় জামা 'আতের সময় হয়ে গেছে। মসজিদে গিয়ে জামা 'আতে নামায আদায় করলে, সাতাশগুণ বেশি সওয়াব হবে। কিন্তু বাবা বলছেন, আমার সাস্থ্য খারাপ; আজ তুমি মসজিদে যেয়ো না। ঘরেই নামায আদায় করে নাও। তাহলে এখন ঘরে নামায আদায় করাই সময়ের দাবি। সাতাশগুণ সওয়াবের জামা 'আত ছেড়ে; ঘরে নামায আদায় কর এবং বাবার খেদমত কর। এটাই সময়ের দাবি; এটাই দ্বীন।

শখ পূরণ করার নাম দ্বীন নয়

আমার শায়েখ হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান রহ. বড় সুন্দর কথা বলতেন। 'নিজের শখ পূরণ করার নাম দ্বীন নয়।' যেমন কারো শখ হল, প্রথম কাতারে নামায আদায় করবে, কিন্তু ঘরে তার পিতা মারা যাচ্ছে। তাকে রেখেই সে শখ পুরা করার জন্য সবার আগে মসজিদে প্রথম কাতারে গিয়ে উপস্থিত! এটা দ্বীন নয়। দ্বীন হল, প্রথম কাতার ছেড়ে এখন সময়ের দাবি হিসাবে পিতার খেদমত কর।

নেক কাজ কি শুধু রমযান মাসেই করা যায়?

হযরত থানভী রহ. তাঁর আলোচ্য বাণীতে যাকাত সম্পর্কে এই নীতিটি আলোচনা করেছেন। আসলে এটি যাকাতের সঙ্গে খাস কোনো নীতি নয়; সব আমলের একই নীতি। আমরা সবাই-ই রমযান মাসে আমলের প্রতি যৎসামান্য গুরুত্বারোপ করে থাকি। কিন্তু এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমরা জীবনের সব আমলই রমযান মাসের জন্য মওকুফ করে রাখছি। নফল পড়ব রমযানে; তিলাওয়াত করব রমযানে; রাত জাগব রমযানে। এভাবে সব আমলই রমযানের জন্য তাকে উঠিয়ে রেখেছি। রমযানে একটু আধটু যা-ই করলাম, যেই রমযান শেষ, আমলও শেষ! না তিলাওয়াত; না নফল; না আল্লাহর যিকির, এমনকি গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতিও এখন কোনো গুরুত্ব নেই। নাউযুবিল্লাহ। রমযানে গোনাহ করতে একটু শরম লাগত, ভাই রমযান

মাস! চোখের হেফাজত কর; কানের হেফাজত কর; যবানের হেফাজত কর, কিন্তু রমযান যেতে না যেতেই সব ছুটি! এখন না গোনাহ থেকে বাঁচার প্রয়োজন আছে; না রমযানে শুরু করা কোনো নেক কাজ চালু রাখার প্রয়োজন আছে! আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন।

রমযান একটি তারবিয়াতি কোর্স

আল্লাহ তা 'আলা মূলত রমযান মাসটি একটি তারবিয়াতি কোর্স হিসাবে আমাদেরকে দান করেছেন। এই কোর্স সম্পূর্ণ করে; রোযা, তারাবী, ইতেকাফ ইত্যাদির মাধ্যমে তোমার মাঝে ইবাদতের যেই যোগ্যতা ও অভ্যাস তৈরি হবে, সারা বছর তার ধারাবাহিকতা ধরে রাখা তোমার দায়িত্ব। সুতরাং রমযান শেষ হওয়া মানেই সব আমল শেষ হয়ে যাওয়া নয়; বরং তখনও যথাসম্ভব আমলগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চেষ্টা তোমাকে চালিয়ে যেতে হবে।

গোনাহের দাগ থেকে দিল পরিচ্ছন্ন রাখুন

দেখুন! যেই সাদা কাপড়টি এইমাত্র ধোপার নিকট থেকে ধুয়ে আনা হয়েছে, তা এখন সাদা ধবধবে। তাতে সামান্য দাগ লাগলেই তা খুব সুস্পষ্ট দেখা যাবে। রমযানে আপনার দিল গোনাহ থেকে ধুয়ে মুছে একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন তাকে গোনাহ থেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করুন। যাতে পরিচ্ছন্ন দিলে গোনাহের কোনো দাগ না লাগে। আল্লাহ যেমন পরিষ্কার করে দিয়েছেন, তেমনই তা পরিষ্কার থাকে।

রমযানের পর তিলাওয়াত চালু রাখুন

রমযানে আল্লাহ যেসব ইবাদতের তাওফীক দিয়েছিলেন, সেগুলো সেই পরিমাণে না হোক; অল্প করে হলেও চালু রাখা চাই। রমযানে কুরআন তিলাওয়াতের তাওফীক হয়েছিল; এখন কেন তা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে? এর অর্থ তো দাঁড়ায়, কুরআন আমি শুধু রমযানের জন্যই রেখেছি। এজন্য এখনই সংকল্প করুন, রমযানের পর যেন একদিনও তিলাওয়াত বাদ না পড়ে। রমযানে খুব তিলাওয়াত করলাম, কিন্তু যেই রমযান গেল, কুরআন কারীম তাকে তুলে রেখে দিলাম, আবার রমযানের চাঁদ দেখলে নামাব এর কোনো অর্থ হয় না। এটা বড়ই বঞ্চনার বিষয়। সুতরাং কুরআন তিলাওয়াত দৈনন্দিনের রুটিনভুক্ত করুন।

রমযানের পরও হিম্মত করে ইবাদতে লেগে থাকুন

রমযানে আলহামদুলিল্লাহ নামাযগুলো জামা 'আতের সঙ্গে আদায় করা হয়। এর অর্থ এটা নয় যে, আগামী এক বছরের জন্য মসজিদ থেকে ছুটি পেয়ে গেলাম। চেষ্টা করুন এই উসিলায় আল্লাহ আজীবন জামা ' আতের সঙ্গে নামায আদায় করার তাওফীক দান করেন। আল্লাহ আমার আপনার উপর যেসব ইবাদত বন্দেগীর দায়িত্ব দিয়েছেন, তা আদায় করা অনেক কষ্টের নয়। এমন হলে আল্লাহ এই দায়িত্বই আমাদের দিতেন না। সুতরাং যত কাজে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট, সবই আমাদের সামর্থ্যে ও অনুকূলে। যেই কাজ আমাদের সামর্থ্যরে বাইরে, আল্লাহ আমাদেরকে সেগুলোর নির্দেশই দেননি। এখন শুধু হিম্মতের ব্যাপার। আল্লাহ বান্দার হিম্মতে অনেক শক্তি রেখেছেন। হিম্মত ব্যবহার করে নিজের ভবিষ্যতজীবন সম্পূর্ণ আল্লাহর বিধি নিষেধ মোতাবেক পরিচালিত করার চেষ্টা চালিয়ে যান। নিশ্চয় সফল হবেন ইনশাআল্লাহ।

সকালে আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করুন

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, প্রতিদিন ফজরের পর আল্লাহর সঙ্গে একটি চুক্তি করে নিন

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۙ۝

"বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ সব আল্লাহর জন্য; হে জগতের প্রতিপালক!"

হে আল্লাহ! আজ আমি যত কাজ করব, সব একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করব। এমনকি আহার গ্রহণ করব তোমার সন্তুষ্টির জন্য; উপার্জন করব তোমার সন্তুষ্টির জন্য; ঘরে প্রবেশ করব তোমার সন্তুষ্টির জন্য; বিবি বাচ্চার সঙ্গে কথাবার্তা বলব তোমার সন্তুষ্টির জন্য; ঘুমাব তো তাও তোমার সন্তুষ্টির জন্যই ঘুমাব। এভাবে দিনের শুরুতে আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করুন। তরপর খাবারের সময় বলুন, হে আল্লাহ! আমি খাবার খাই আমার উপর অর্পিত নফসের হক আদায় করার জন্য। ঘুমাচ্ছি আমার নফসের হক আদায় করার জন্য। বিবি বাচ্চার সঙ্গে কথা বলছি, কারণ আপনি আমার উপর তাদের হক ওয়াজিব করেছেন। উপার্জন করছি, কারণ আপনি তা আমার উপর ফরয করেছেন। এভাবে নিয়ত করে করে যখন কাজগুলো করবে, তখন তোমার সবগুলো কাজ ইবাদতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

ওয়াদার ফায়দা

তারপর আল্লাহর নিকট দু 'আ কর, হে আল্লাহ! তোমার সঙ্গে আমি যে ওয়াদা করেছি, তোমার তাওফীক ছাড়া আমি তা ঠিক রাখতে পারব না। সুতরাং ওয়াদা পূরণ করার তাওফীকও আল্লাহ তুমিই আমাকে দান কর। ওয়াদা ও দু 'আ করার পর কাজে নেমে পড়। ওয়াদার ফায়দা হবে, কোনো অন্যায় কাজের কথা মাথায় আসলেই দিলে ধাক্কা লাগবে, আরে আমি তো সকালেই আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করেছি, এখন কিভাবে তা ভঙ্গ করব?

রাতে ঘুমানোর সময় হিসাব নাও

এরপর রাতে ঘুমানোর সময় সারা দিনের হিসাব নাও। আমি সকালে আল্লাহর সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিলাম, তার কতটুকু রক্ষা করেছি, আর কতটুকু ভঙ্গ করেছি। যদি ওয়াদামতো সব ঠিক হয়ে থাকে, আল্লাহর শোকর আদায় কর আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি ওয়াদা পরিপন্থী কিছু হয়ে থাকে, ইস্তেগফার কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলাম, কিন্তু তা রক্ষা করতে পরিনি; অমুক সময় আমার চোখের পদস্খলন হয়েছে; অমুক সময় যবানের পদস্খলন হয়েছে;

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَلِيَّ الْعَظِيْمَ.

এভাবে কয়েকবার ইস্তেগফার করে শুয়ে পড়। আবার সকালে উঠে সারাদিনের জন্য ওয়াদা কর; রাতে শোয়ার সময় মুহাসাবা ও ইস্তেগফার কর। এভাবে চলতে থাকলে ধীরে ধীরে একদিন সব গোনাহ ছুটে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী মাজালিস (২/১০৮-১২৭), বাদ জোহর,

দারুল উলূম জামে মসজিদ, করাচী

শবে কদরের ফযীলত

اَ لْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَ عَلٰى اٰلِه

وَ أَصْحَابِ

أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۝ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ۝١ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢ لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۙ۬ خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝٣ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ الرُّوْحُ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝٤ سَلٰمٌ ۛ۫ هِیَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

অর্থ : (১) নিশ্চয়ই আমি এটা (অর্থাৎ কুরআন) শবে কদরে নাযিল করেছি। (২) তুমি কি জান শবে কদর কী? (৩) শবে কদর এক হাজার মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। (৪) সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়। (৫) সে রাত (আদ্যপান্ত) শান্তি ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত। (সূরা কদর, আয়াত ১-৫)

শেষ দশকের গুরুত্ব

বুযুর্গানে মুহতারাম ও বেরাদারানে আযিয! আল্লাহর অনেক বড় দয়া ও এহসান, তিনি আমার আপনার জীবনে রমযানের মতো রহমত ও বরকতপূর্ণ একটি মাস আরেকবার দান করেছেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে রমযানের বিশদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। শেষ দশক আরম্ভ হতে যাচ্ছে। এই শেষ দশক পুরো রমযানের প্রাণ। আল্লাহ রমযানের শেষ দশককে এমন মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা মহিমান্বিত করেছেন, যা পুরো বছরের আর কোথাও নেই।

শেষ দশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা

এমনিতে তো পুরো রমযান মাসই বিশেষ বরকত ও রহমতের আধার। রমযানের প্রতিটি মুহূর্ত বিশেষভাবে মূল্যায়ন করার মতো। উপরন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা মোতাবেক রমযানের শেষ দশক ইবাদত বন্দেগীর বিশেষ একটি মুহূর্ত।

হাদীসে এসেছে, যখন রমযানের শেষ দশক আসত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যেত।

شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَضَ أَهْلَهُ

'তিনি কোমরে গামছা বেঁধে ইবাদতে লেগে যেতেন। সারা রাত জেগে ইবাদত বন্দেগী করতেন। পরিবারের লোকদেরও জাগিয়ে দিতেন।'

তিনি তো সারা বছরই লম্বা লম্বা তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। কখনো রাতের দুই তৃতীয়াংশ; কখনো অর্ধরাত দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। রমযানের শেষ দশকে তা আরো অনেক বেড়ে যেত। আম্মাজান হযরত আয়শা রাযি.-এর ভাষায় যার বিবরণ হল, 'তিনি কোমরে গামছা বেঁধে ইবাদতে লেগে যেতেন।'

স্বাভাবিক সময় তাহাজ্জুদের জন্য জাগার ধরন

স্বাভাবিক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদের জন্য উঠার বিবরণ হল

اِنْتَعَلَ رُوَيْداً وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْداً ، ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا

খুব ধীরে শান্তভাবে জুতা পরিধান করতেন; খুব শান্তভাবে চাদর নিতেন এবং শান্তভাবে দরজা খুলতেন।

যাতে আওয়াজ পেয়ে হযরত আয়শা রাযি.-এর ঘুম ভেঙ্গে না যায়। কারণ তাহাজ্জুদ পড়তে গিয়ে কাউকে কষ্ট না দেয়া এবং কারো ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটানোও তাহাজ্জুদের আদবের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব শান্তভাবে উঠতেন এবং শান্তভাবে নড়াচড়া করতেন, যাতে কারো আরামের ক্ষতি না হয়, চাই তিনি স্বীয় স্ত্রীই হন না কেন।

শেষ দশকে পরিবারের লোকদেরকে জাগানো

কিন্তু রমযান মাসের শেষ দশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তখন তিনি পরিবারের সবাইকে জাগিয়ে দিতেন। বলতেন উঠ! রমযানের শেষ দশক চলছে। আল্লাহর রহমতের বসন্ত বইছে। অনবরত তাঁর রহমতের বারি বর্ষিত হয়ে চলেছে। এখন শুয়ে থাকা বঞ্চনার কথা। উঠ! উঠে আল্লাহর রহমতের সরোবরে অবগাহন কর।

পূর্বেকার উম্মতের ইবাদতের বয়স

শেষ দশকে আল্লাহ কদরের রাত রেখেছেন, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এটা আল্লাহ কেন করলেন? কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সামনে পূর্বেকার উম্মতের আবেদদের আলোচনা

করেছেন। তারা অনেক লম্বা লম্বা হায়াত পেত এবং অনেক দীর্ঘকাল ধরে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে

فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَ هُمْ ظٰلِمُوْنَ

অর্থ : সে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিল পঞ্চাশ কম হাজার বছর। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করল, যেহেতু তারা ছিল জালেম।

হযরত নূহ আ. সম্পর্কে বলা হয়েছে, আপনি তাদের মাঝে সাড়ে নয়শ বছর অবস্থান করেছেন।

এছাড়া অন্যান্য উম্মতের জীবনও অনেক দীর্ঘ হত। পাঁচশ, সাতশ বা হাজার বছর পর্যন্ত তারা হায়াত পেত।

সাহাবায়ে কেরামের আফসোস

সাহাবায়ে কেরামের সামনে যখন তাদের বয়সের আলোচনা হল, তাঁরা আফসোস করলেন। তারা এত লম্বা হায়াত পাওয়ায় আল্লাহর অনেক ইবাদত বন্দেগীর সুযোগ পেয়েছে। এমন হায়াত পেলে তো আমরাও তাঁর ইবাদত করতে পারতাম। তাদের হাজার বছর হায়াত ও ইবাদতের সামনে তো আমাদের ষাট সত্তর বছরের ইবাদত কিছুই না। এই অল্প সময়ে হাজার চেষ্টা করেও তো আমাদের তাদের ধারে কাছে পৌঁছারও সম্ভাবনা নেই। আফসোস! আমাদের তাহলে এই সামান্য ইবাদতেই তুষ্ট হতে হবে!?

কদরের রাত শুধু কল্যাণই কল্যাণ

তখন আল্লাহ সূরায়ে কদর নাযিল করলেন। বলে দিলেন, হে উম্মতে মুহাম্মাদী! তোমাদের ঘাবড়ানোর কারণ নেই। তোমাদের বয়স পূর্বের উম্মত থেকে কম; কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি তোমাদেরকে এমন একটি বরকতময় রাত দান করলাম, যেই রাতের ইবাদত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

এখানে আল্লাহ কদরের রাতকে হাজার মাস থেকে উত্তম বোঝানোর জন্য আরবী 'খায়র' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষা সম্পর্কে যারা অবগত তারা জনেন, খায়ের অর্থ অধিক উত্তম। দুটি বিষয়ের মাঝে উনিশ বিশের পার্থক্য হলে খায়ের শব্দটি ব্যবহৃত হয় না; বরং আসমান যমিন ব্যবধান হলেই তখন ভালোটার জন্য খায়ের শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা যেতে পারে আসমান যমিন থেকে উত্তম।

হাজার মাস থেকে অনেক উত্তম

এজন্য কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ

কদরের রাত হাজার মাস থেকেও অনেক উত্তম।

এর অর্থ এই নয় যে, কদরের রাত হাজার মাসের মতো বা কাছাকাছি; বরং তা এত বেশি উত্তম যা আমাদের হিসাব নিকাশের বাইরে।

এই নেয়ামত অন্বেষণ কর

আল্লাহর একটি হেকমত হল, এত বড় নেয়ামত যদি এমনিতেই তিনি দিয়ে দিতেন, তাহলে তার যথার্থ মূল্যায়ন হত না। এজন্য এমন ব্যবস্থা রেখেছেন, যেন তা পেতে হলে কিছুটা মেহনত ও পরিশ্রম করতে হয়। ফলে কোন্ রাতটি শবে কদর? তা আল্লাহ সুনির্দিষ্ট করে বলে দেননি। অবশ্য এতটুকু জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাতটি রমযানের শেষ দশকের যে কোনো বেজোড় রাত। ২১ থেকে ২৯তম যে কোনো বেজোড় রাতই হতে পারে শবে কদর। এক বছর ২৫তম রাতে শবে কদর হলে, পরবর্তী বছরও একই রাতে হবে, তাও জরুরি নয়। প্রতি বছর তা ভিন্ন ভিন্ন রাতেও হতে পারে। সুতরাং শবে কদরের ফযীলত ও মর্যাদা পেতে হলে ২১ থেকে ২৯ পর্যন্ত মোট পাঁচটি বেজোড় রাত জেগে তালাশ করতে হবে। আসলে এত বড় ফযীলতের জন্য পাঁচ রাত কেন, পাঁচ সপ্তাহ বা পাঁচ মাস জাগলেও তো বেশি নয়।

রাতটি এভাবে কাটাও

কিছু কিছু লোক এই রাতের সময়গুলো অযথা নষ্ট করে। অনেকে অবশ্য চেষ্টা করে, এই রাতের সময়গুলো যেন ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত হয়, কিন্তু তাদেরও অনেকে রাতটি থেকে পূর্ণ ফায়দা হাসিল করতে পারে না। এই রাতটি আল্লাহ দান করেছেন মূলত বান্দা যেন নির্জনে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে কাকুতি মিনতির সঙ্গে তাওবা ইস্তেগফার করে। তাসবীহ তাহলীল পড়ে; নফল নামায আদায় করে। সবচেয়ে উত্তম হল লম্বা লম্বা নফল নামায আদায় করা। যেখানে লম্বা কেরাত হবে; লম্বা রুকু হবে এবং লম্বা সেজদায় মাসনূন দু ‘আ হবে।

দ্বিতীয়ত তিলাওয়াত করা এবং তৃতীয়ত যিকির আযকার ও তাসবীহ তাহলীল পড়া। যেমন সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজিম, তিন তাসবীহ, দরুদ শরীফ, ইস্তেগফার ইত্যাদি। উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে এগুলো যবানে জারি থাকা চাই। কোনো কাজে ব্যস্ত থাকলেও যবান আল্লাহর যিকিরে তরতাজা থাকা চাই।

তাছাড়া এই রাতে দু ‘আর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা চাই। কারণ এই রাতের দু ‘আ আল্লাহর নিকট বিশেষভাবে পছন্দনীয়। নিজের সকল প্রয়োজনের কথা আল্লাহর নিকট পেশ কর। আল্লাহর নিকট দুনিয়ার প্রয়োজনের কথা বললেও সওয়াব হয়। আল্লাহ আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও; আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করে দাও; আমাকে হালাল রুজি দাও ইত্যাদি। এগুলো দুনিয়াবী প্রয়োজন। তথাপি আল্লাহ এগুলো চাইলেও বান্দাকে সওয়াব দান করেন। এগুলোই মূলত এই রাতের কাজ। সুতরাং যথাসম্ভব এগুলো বেশি বেশি করার চেষ্টা করতে হবে।

এই রাত সভা সমাবেশের রাত নয়

কিন্তু আফসোসের বিষয়, কিছু লোক রাতটিকে ইজতেমায়ী কাজের রাত বানিয়ে ফেলেছে। মেলা বসানোর রাত বানিয়ে নিয়েছে। আজ সভা হবে; আলোচনা হবে; অমুক মাওলানা সাহেবের ওয়াজ হবে; দাওয়াত হবে; আপ্যায়ন হবে ইত্যাদি। সারারাত যতসব অহেতুক পিছনেই বরবাদ। আরে ভাই এই রাতের ফযীলত বোঝানোর এবং আমল শিখানোর মাহফিল আগেই করে নাও। এই রাতে শুধু আমল কর। এটা তো আমলের রাত; সভা সমাবেশের নয়। এই রাতে সভা সমাবেশ করা তো যুদ্ধের ময়দানে নেমে প্রশিক্ষণ দেয়ার মতো। যুদ্ধের

ময়দানে তো প্রশিক্ষণের সময় নেই; এখানে প্রশিক্ষণে লাগলে তো মুহূর্তেই শত্রু তোমার কাম সারা করে দিবে। ময়দান তো লড়াই করার জায়গা; প্রশিক্ষণের নয়। ঠিক একইভাবে কদরের রাত আমল শিখার রাত নয়; আমল করার রাত। সুতরাং সভা সমাবেশে এই রাত অতিবাহিত করা মানে তার অবমূল্যায়ন করা।

নির্জনে কাটানোর রাত

এই রাত তো এমন, যেখানে বান্দা একাকী এক কোনে বসে যাবে। এবার বান্দা আর তার আল্লাহর মাঝে গোপন অভিসার চলবে। তৃতীয় কোনো অস্তিত্বের আভাস সেখানে থাকবে না। আল্লাহর নিকট দু 'আ করবে; কাকুতি মিনতি জানাবে; যিকির আযকার, তাসবীহ তাহলীল ইত্যাদিতে রাত পার করবে। এটা হচ্ছে এই রাতের আসল ক্ষেত্র। এগুলো বাদ দিয়ে মানুষ এই রাতে যে মেলা সমাবেশের আয়োজন করে, সেগুলো পরিহার করে; প্রতিটি মুহূর্ত গনিমত মনে করে; নফল ইবাদত বন্দেগীতে কাটানোর চেষ্টা করতে হবে।

শরীয়তে নফল ইবাদত ইজতেমায়ীভাবে আদায় করাও পছন্দনীয় নয়। সুতরাং এই রাতে যে সবিনা হয়, তাও অপছন্দনীয়। উত্তম হল নফল ইবাদত একা একা করা। তাছাড়াও এসব সবিনায় আরো অনেক অপছন্দনীয় বিষয়ের সমাবেশ ঘটে। অবশ্য কেউ যদি মনে করে, আমি একা একা ঘরে বসে থাকলে ঘুমিয়ে পড়ব; মসজিদে গেলে কিছু ইবাদত করতে পারব, তবে তার জন্য এতটুকুর অবকাশ আছে। সে মসজিদে গিয়ে একা একা নফল ইবাদতে মশগুল হবে। তবে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, নফল ইবাদত ঘরে বসে করলে যেই সওয়াব পাওয়া যাবে, তা মসজিদে এসে পাওয়া যাবে না, কারো ওজর থাকলে ভিন্ন কথা।

প্রত্যেক কাজকে যথাস্থানে রাখুন

আল্লাহ তা 'আলা সব বিষয়কে যথাস্থানে রেখেছেন। ফরয নামায মসজিদে গিয়ে জামা 'আতের সঙ্গে আদায় করার তাকিদ করেছেন। পক্ষান্তরে নফল নামায ঘরে একা আদায় করার তাকিদ করেছেন। জামা 'আত পরিহার করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্যই নফল নামাযের জামা 'আত জায়েয নেই। সুতরাং আমল করতে হলে শরীয়তের নির্দেশনা মেনেই আমল কর; আবেগের বশবর্তী হয়ে যেভাবে ইচ্ছা আমল করো না এবং শরীয়তের বিধান জলাঞ্জলি দিও না।

এটি প্রার্থনার রাত

খোলাসা কথা হল, এজাতীয় রাতগুলো এভাবে উপরের নির্দেশনা অনুযায়ীই কাটাতে হবে। আল্লাহ যদি এভাবে একটি রাত কাটানোর তাওফীক দেন, হতে পারে এতে আমার আখেরাতের তরী পার হয়ে যাবে। অতএব এই রাতগুলোতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি সবার দ্বীন দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণের জন্য খুব বেশি বেশি দু 'আ করতে হবে। হে আল্লাহ! মেহেরবানী করে আমাদের সব ঠিক করে দাও। যদি এভাবে রাতটি কাটাতে পার তাহলে আমাদের এই রাতও সার্থক, রমযান মাসও সার্থক এবং আমাদের আমল, দু 'আ সবই সার্থক। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই মূল্যবান সময়গুলো যথাযথ কাজে লাগানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

রমযান মাস নিরাপদে অতিবাহিত করুন

রমযানের শুরুতেও বলেছি, এক হাদীসে এসেছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

إذا سَلِمَ رَمَضانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ

যে ব্যক্তির রমযান নিরাপদে অতিবাহিত হয়, তার সারা বছর নিরাপদে অতিবাহিত হয়। তাই রমযানের যেই দিনগুলো বাকি আছে, চেষ্টা করুন যাতে নিরাপদে অতিবাহিত করা যায়। কোনো গোনাহ আমার দ্বারা সংঘটিত না হয়। চোখের গোনাহ, কানের গোনাহ, যবানের গোনাহ, ও হাত-পায়ের গোনাহ থেকে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করুন। আল্লাহমুখী হয়ে সময় কাটাবার চেষ্টা করুন। আল্লাহ যদি এভাবে নিরাপদে রমযান কাটানোর তাওফীক দেন, তাহলে বছরের বাকি সময়গুলো নিরাপদে কাটার ওয়াদা রয়েছে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত (১৪/৩০-৪২), বাদ জোহর,

বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

রমযানের শেষ দশক

اَ لْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَ عَلٰى اٰلِه

وَ أَصْحَابِه أَجْمَعِيْنَ

أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۝ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا۝۴۱ وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا۝۴۲

অর্থ : (৪১) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে স্মরণ কর অধিক পরিমাণে।

(৪২) এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তার তাসবীহ পাঠ কর।

রমযানের শেষ দশক পুরো রমযানের খোলাসা ও নির্যাস। এই দশকে আল্লাহ তাঁর দান ও রহমতের দরজাসমূহ পূর্ণরূপে খুলে দেন। দিন রাত সর্বদা আল্লাহর রহমতের বারি বর্ষিত হতে থাকে। এই দশকের যে কোনো বেজোড় রাতই শবে কদর হতে পারে। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, যখন রমযানের শেষ দশক শুরু হত

شَدَّ مِيْزَرَهٗ وَأَحْيَا لَيْلَهٗ وَأَيْقَضَ أَهْلَهٗ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত বন্দেগীর জন্য কোমরে গামছা বেঁধে নিতেন; রাত্রি জাগরণ করতেন এবং পরিবারের লোকদেরকে জাগিয়ে দিতেন।

شَدَّ مِيْزَرَهٗ এর শাব্দিক অর্থ লুঙ্গি বাঁধতেন। উদ্দেশ্য হল অনেক বেশি পরিমাণ ইবাদত করার জন্য শক্ত করে প্রস্তুত হয়ে যেতেন। শেষ দশকের রাতগুলো জাগ্রত থেকে ইবাদত করতেন। ঘরের লোকদেরও জাগিয়ে দিতেন। স্বাভাবিক সময়গুলোতে তাঁর অভ্যাস ছিল তাহাজ্জুদের জন্য এমনভাবে উঠতেন, যাতে কারো ঘুম না ভাঙ্গে। হাদীসে এসেছে

اِنْتَعَلَ رُوَيْداً وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْداً ، ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا

খুব ধীরে শান্তভাবে জুতা পরিধান করতেন; শান্তভাবে চাদর নিতেন এবং শান্তভাবে দরজা খুলতেন।

কিন্তু রমযানের শেষ দশকে তিনি ঘরের লোকদেরকে জাগিয়ে দিতেন। বলতেন এখন আল্লাহর ইবাদতের সময়, উঠ; নামায পড়। কোনো বর্ণনায় আছে كَثُرَ صَلَاتُهٗ এই দিনগুলোতে তাঁর নামাযের পরিমাণ বেড়ে যেত। শেষ দশকে তাঁর আমল শুধু বেজোড় রাতের সঙ্গে খাস ছিল না; প্রতি রাতেই করতেন।

শেষ দশকের সঠিক ব্যবহার

আব্বাজান হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. বলতেন, রমযানের শেষ দশক সভা সেমিনার, ওয়াজ নসিহত ও দাওয়াতে কাটিয়ে দেয়া খুবই খারাপ কথা। এই রাতগুলো এসব কাজের জন্য নয়; বরং তা আমলের জন্য। সুতরাং এসব কাজে রাতগুলোর ব্যবহার সঠিক ব্যবহার নয়। এই সময়গুলোতে বান্দা নির্জনে আল্লাহর সঙ্গে এমন সম্পর্ক স্থাপন করবে যে, বান্দা আর আল্লাহ ব্যতীত তৃতীয় কারো আভাসও সেখানে থাকবে না। এমনভাবে আল্লাহর যিকির করবে যে, চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে সর্বদা তার দিল যবান সব আল্লাহর যিকিরে রত থাকবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ﴿﴾

হে ঈমানদারেরা! আল্লাহর যিকির বেশি বেশি কর।

আল্লাহ আমাদের অন্তরে তাঁর যিকিরের মুহাব্বত পয়দা করে দিন এবং অধিক পরিমাণে যিকির করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

যিকির কে করবে?

কিছু লোক মনে করেন, যিকির তো সূফীরা করবে। আলেম ওলামার সঙ্গে যিকিরের কি সম্পর্ক? তারা কিতাবাদি পড়বে, পড়াবে, মোতালা 'আ করবে। যিকির হল সূফীদের কাজ; খানকায় বসে তারা যিকির করবে।

খুব ভালো করে খেয়াল করুন! আমি যেই আয়াত আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি, তাতে সকল মুমিনকে সম্বোধন করা হয়েছে। আলেমরাও কিন্তু মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত। যারা চিন্তা করেন, আমাদের কাজ শুধু কিতাব পড়া ও পড়ানো এবং কুরআন সুন্নাহর নির্দেশিত যিকির থেকে বিরত থাকেন, তাদের জন্য এটা অনেক ভয়াবহ বিষয়। কারণ আয়াতে সকল মুমিনকে সমম্বোধন করে বলা হয়েছে হে ঈমানদারেরা! বেশি বেশি

আল্লাহর যিকির কর। এখান থেকে এ কথাও স্পষ্ট যে, দুই চারবার যিকির করে নেয়াও যথেষ্ট নয়; বরং চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে, অনেক বেশি পরিমাণে যিকির করতে হবে।

জুমুআতুল বিদার তাৎপর্য ও ঈদুল ফিত্র

اَ لْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَ عَلٰى اٰلِ

وَ أَصْحَابِه

- !أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۝ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

অর্থ : এবং (তিনি চান) যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূরণ করে নাও এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন, সে জন্য আল্লাহর তাকবীর পাঠ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

বেরাদারানে আযিয! আল্লাহ তা 'আলার অনেক বড় দয়া ও এহসান, তিনি আমাদেরকে মেহেরবানী করে আরেকটি রমযান মাস দান করেছেন। রমযান এমন একটি মাস, যাতে আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি মুষলধারে বর্ষিত হয়। যাতে আল্লাহর রহমত বান্দার মাগফিরাতের বাহানা তালাশ করে। যেখানে ছোট ছোট আমলের উপর আল্লাহর বড় বড় রহমতের ওয়াদা রয়েছে। আজ সেই মুবারাক মাসের সর্বশেষ জুমু 'আ। মাস শেষ হওয়ার কয়েকদিনমাত্র বাকি।

ঈদ মুবারাক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ

প্রত্যেক জাতি ও ধর্মে নির্ধারিত কিছু দিন আছে, যাতে ঐ জাতি বা ধর্মাবলম্বীরা খুশি উদযাপন করে। সমাজে এই দিনগুলো উৎসবের দিন হিসাবে পরিচিত। সবার উৎসবের ধরন ও প্রকৃতি ভিন্ন হলেও মৌলিকভাবে খুশি উদযাপনের বিষয়টি সবগুলোতেই আছে।

মানুষের স্বভাব সে এক ধরনের কাজে রত থাকতে থাকতে একঘেঁয়েমি বোধ করে। এজন্য সে এমন কিছু সময়ের প্রত্যাশা করে, যাতে দৈনন্দিনের নিয়মতান্ত্রিক রুটিন থেকে সরে গিয়ে একটু ভিন্নভাবে হাসি খুশির মধ্যে অতিবাহিত করবে। মানুষের এই স্বভাবই মূলত উৎসবের জন্ম দেয় এবং এক পর্যায়ে তা কোনো জাতি বা ধর্মের শি 'য়ার ও নিদর্শনে পরিণত হয়।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে যখন মদীনায় গেলেন, দেখলেন সেখানকার লোকেরা নওরোজ ও মেহেরজান নামে উৎসব পালন করে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারব? তিনি বললেন না; আল্লাহ তোমাদেরকে তার পরিবর্তে আরো উত্তম দুটি দিন দান করেছেন। একটি ঈদুল ফিত্র, অন্যটি ঈদুল আযহা।

তখন থেকে উম্মতে মুসলিমার জন্য খুশির উৎসব হিসাবে এই দুটি দিন ধার্য হয়েছে। যাতে একদিকে মানুষের স্বভাবজাত চাহিদাখুশির দিকটি যেমন লক্ষ রাখা হয়েছে; তেমনি শিক্ষণীয় অনেক আমলের সবকও তাতে রয়েছে।

উৎসবের জন্য সাধারণত অধিকাংশ সম্প্রদায়ই এমন দিন ধার্য করে, যাতে অতীতে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। যেমন খৃস্টানরা হযরত ঈসা আ.-এর জন্মদিনের স্মৃতিচারণ করে ২৫শে ডিসেম্বর উৎসব পালন করে। (যদিও ঐতিহাসিক সত্য হল, হযরত ঈসা আ.-এর জন্মতারিখ সুনিশ্চিত কারোই জানা নেই।) ইহুদীদের উৎসব হয় যেদিন তাদেরকে আল্লাহ ফেরাউনের জুলুম নির্যাতন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, সেই দিনকে কেন্দ্র করে। হিন্দুদেরও অনেক উৎসব এ জাতীয় কোনো না কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করেই হয়।

ইসলামের ইতিহাসে এমন ঐতিহাসিক ঘটনার কোনো কমতি ছিল না, যাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর মুসলমানরা সমষ্টিগতভাবে উৎসব পালন করতে পারত। শুধু দুনিয়ার জন্য নয়; সৃষ্টিজগতের জন্য সবচেয়ে সৌভাগ্যের দিন তো ছিল সেই দিন, যেদিন সাইয়েদুল আউয়ালীন ওয়াল-আখিরীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জগতে তাশরীফ নিয়ে এসেছিলেন, কিংবা তিনি যেদিন মানবতার মুক্তির বার্তা নবুওয়তের মতো মহান দায়িত্বের আসনে সমাসীন হয়েছিলেন এবং তাঁর উপর আল্লাহর কালামকুরআনে কারীম অবতীর্ণ হতে শুরু করেছিল। সেই দিনের মর্যাদাও কোনো অংশে কম ছিল না, যেদিন তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় বসতি গড়েছিলেন এবং সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্র ও খেলাফতে ইলাহির ভিত্তি প্রস্তর রেখেছিলেন। সেই দিনের মাহাত্ম ও মর্যাদাই বা কম কিসে, যেদিন তিনি খালি হাতে প্রায়; মাত্র তিনশ তেরজন জানবাজ সাহাবী নিয়ে; বদর

প্রান্তরে; সর্বপ্রকার সমরাস্ত্র সজ্জিত বাতিলকে থান থান করে দিয়েছিলেন। যাকে খোদ কুরআনে কারীম 'ইয়াওমুল ফুরকান' তথা হক বাতিলের

মাঝে পার্থক্য নিরুপণকারী দিন বলে সাব্যস্ত করেছে। যেদিন মক্কা মুকাররামা বিজয় হয়েছিল এবং সর্বপ্রথম কা'বার ছাদ থেকে হযরত বেলালে হাবশির আযান গুঞ্জরিত হয়েছিল, সেদিনের মুসলমানদের খুশিই বা আপনি কিভাবে অনুমান করবেন?

মোটকথা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতে মুবারাকায় এমন অসংখ্য আলোকিত ঘটনা বিদ্যমান, যার একটিকে কেন্দ্র করে সারা বছর উৎসব পালন করলেও আতিশয্যের কিছু ছিল না। বরং সত্য বলতে গেলে, তাঁর হায়াতে তাইয়েবার প্রতিটি দিনই ছিল এমন, যেখানে মুসলমানদের কোনো না কোন সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছিল।

কিন্তু ইসলামের এই বৈশিষ্ট্য খুবই স্বতন্ত্র। এসব কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে উৎসবের দিন ধার্য করা হয়নি। ইসলামে ঈদ ও উৎসবের দিন ধার্য করা হয়েছে ১লা শাওয়াল ও ১০ই যিলহজ্ব। যেগুলোর সঙ্গে বাহ্যত কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার সম্পর্ক নেই। দিনগুলো এমন এক সময় নির্ধারিত করা হয়েছে, যখন পুরো উম্মতে মুসলিমা সমষ্টিগতভাবে এমন দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত থেকে ফারেগ হয়, যার সুযোগ বছরে দ্বিতীয়বার আসে না। ঈদুল ফিত্রের উৎসব হয় ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন মুসলমানরা রমযান মাসের রোযা থেকেই শুধু ফারেগ হয় না; বরং পুরো মাসব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কোর্স অতিক্রম করে নিজের রুহ ও আত্মাকে আল্লাহর

নূরের আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে। ঈদুল আযহার উৎসব হয় ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন মুসলিম উম্মাহ আরেকটি বার্ষিক ইবাদত; ইসলামের রুকনহজ্ব থেকে ফারেগ হয় এবং একই সঙ্গে লাখো মুসলমান আরাফার ময়দানে রোনাযারি করে; আল্লাহর রহমতের সরোবরে অবগাহন করে; নিজেদের মাগফিরাত অর্জনের পর এক বে-গোনাহ নতুন জীবনের সূচনা করে। যারা হজ্বে অংশগ্রহণ করতে পারে না, তারা আল্লাহর পথে কুরবানি পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করে।

এভাবে ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে ঈদ-উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু না বানিয়ে; এমন এক বিষয়কে বানিয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলমানেরই বিশাল বড় অর্জন ও খুশির বিষয় এবং যার আগমন ঘটে প্রতিবছর।

কারণ অতীতে পবিত্র ও বিস্ময়কর বা ঐতিহাসিক যা কিছু ঘটেছে, সবই তো অতীত হয়ে গেছে। বর্তমান-ভবিষ্যতের নির্মাণ শিক্ষা ও প্রেরণা অর্জনের জন্য তা স্মরণ রাখা কাম্য কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সর্বদা অতীত নিয়ে ব্যস্ত থাকা এবং অতীতে হারিয়ে যাওয়া অনেক সময়ই নিজের বর্তমান ভবিষ্যত ও আসল করণীয় সম্পর্কে গাফেল করে রাখে। তখনই মানুষ ভর্ৎসনার পাত্র হয়। যেমন কবি বলেছেন

!تھے تو آبا وہ تمھارے ہی مگر تم کیا ہو؟   ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو

তারা তো ছিল তোমার পূর্বপুরুষ, তুমি কি হয়েছ? তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে তুমি নিজে আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা কর।

সুতরাং দুই ঈদকে ঐতিহাসিক কোনো ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত না করে; আমাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তোমাদের খুশি হওয়া তো সাজে তোমাদের নিজের কীর্তির উপর, যা তোমরা নিজেরা অর্জন করেছ। তোমাদের বাপ দাদা যা অতীতে আঞ্জাম দিয়েছে, তাতে তোমাদের উৎসব করার কি আছে?

অতএব ঈদের প্রতিটি দিন আমাদের কাছে দাবি করে, আমরা যেন চিন্তা করি; আমাদের অবস্থা এবং আমাদের নিজেদের কর্ম ও অর্জন কি আনন্দ-উৎসব পালন করার যোগ্য? ঈদুল ফিত্র হচ্ছে রমযানের তারবিয়াতি কোর্সের কামিয়াবি ও সফলতার পুরস্কার। এজন্য এই দিনকে হাদীসে 'ইয়াওমুল জাওয়াইয' বা পুরস্কার-দিবস বলা হয়েছে। এই দিনটি আমাদেরকে প্রশ্ন করে, বাস্তবে আমরা রমযানের তারবিয়াত ও প্রশিক্ষণ কতটুকু গ্রহণ করেছি? আমাদের আমল আখলাকের আসলেই কোনো উন্নতি হয়েছে কি না? আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আগের চেয়ে আরো দৃঢ় হয়েছে কি না? আমরা মাখলুকের হক আদায় করা আরম্ভ করেছি কি না? আমাদের অন্তরে আমানত, দিয়ানত, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও দ্বীনের জন্য কষ্ট ক্লেশ বরদাশত করার প্রেরণা তৈরি হয়েছে কি না? আমরা সমাজের অন্যায় অনাচার নির্মূল করার এবং তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার অঙ্গীকার নবায়ন করেছি কি না? দ্বীন ও জাতির কামিয়াবি ও সফলতার জন্য আমার অন্তরে কতটুকু দরদ ও ব্যাকুলতা তৈরি হয়েছে? ঈদগাহে আমাদেরকে যেরকম ঐক্যবদ্ধ মনে হচ্ছে, বাস্তবেই আমরা আমাদের ঝগড়া বিবাদ নিরসনে এবং শত্রুদের মোকাবেলায় এরকম ঐক্যবদ্ধ হয়েছি কি না? ইনসাফের সঙ্গে নিজের দিলের দিকে তাকালে যদি কেউ এই প্রশ্নগুলোর যথার্থ উত্তর খুঁজে পায়, কিংবা অন্তত কিছু প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর আসে, তবে তাকেই বলা যায় ঈদ মুবারাক ।

সূত্র : যিক্র ও ফিকর, পৃ. ৫৫-৫৮

৩০শে রমযান, ১৪১৪হিজরী ১৩ই মার্চ, ১৯৯৪ ঈসায়ী

ঈদুল ফিত্র একটি ইসলামী উৎসব

اَ لْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَ عَلٰى اٰلِه

وَ أَصْحَابِه

أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ! •

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۝ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

[অর্থ: এবং (তিনি চান) যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূরণ করে নাও এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন, সেজন্য আল্লাহর তাকবীর পাঠ কর এবং কৃতজ্ঞা প্রকাশ কর।]

মুহতারাম ভাই বুযুর্গ ও বেরাদারানে ইসলাম! আল্লাহর এই মহান নেয়ামতের উপর যত শোকরই আদায় করি তবুও কম হবে। তিনি মেহেরবানী করে আমাদেরকে রমযানের মতো রহমত ও বরকতপূর্ণ একটি মাস দান করেছেন এবং তার বরকত দ্বারা আমাদেরকে সৌভাগ্যবান করেছেন। রোযা রাখার, তারাবী পড়ার এবং সর্বশেষ এইসব নেয়ামত অর্জনের খুশিতে ঈদুল ফিত্রের উৎসব করারও তাওফীক দান করেছেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِه ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَآءِ رَبِّه • •

রোযাদারের জন্য দুটি খুশির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একটি খুশি যখন সে ইফতার করে; আরেকটি খুশি যখন সে তার প্রভুর দিদার লাভে ধন্য হবে।

প্রকৃত খুশি তো সেটাই, যেটা অর্জিত হবে আখেরাতে; আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিদার লাভের সময়। আল্লাহ প্রত্যেক মুমিনকে এই খুশি নসিব করুন। আমীন।

ইফতারের সময় খুশি

কিন্তু আখেরাতের সেই প্রকৃত খুশির সামান্য ঝলক ও নমুনা আল্লাহ দুনিয়ায়ও বান্দাকে দান করেছেন। যা রোযাদার বান্দা ইফতারের সময় অনুভব করে। ইফতার দুই প্রকার। একটি দৈনন্দিনের ইফতার, যা প্রত্যেক রোযাদার দৈনিক সন্ধ্যাবেলা করে। এই ইফতারেও রোযাদার অনেক খুশি ও আনন্দ অনুভব করে। একটু খেয়াল করে দেখুন! সারা বছরের খাওয়া দাওয়ায় কিন্তু এত আনন্দ ও খুশি অনুভূত হয় না, যেই আনন্দ ও খুশি অনুভূত হয় ইফতারের খাবারে। এই আনন্দের অভিজ্ঞতা কম বেশি সবারই আছে। উলামায়ে কেরাম দৈনিকের এই ইফতারকে বলেন ইফতারে আসগার তথা ছোট ইফতার। আরেক ইফতার হল, যেটা রমযানের মাসশেষে হয়। যখন ঈদুল ফিত্রের আনন্দ হয় এবং রোযার মেয়াদ শেষ হয়ে সারা দিনের পানাহার বৈধ হয়। এটাকে বলা হয় ইফতারে আকবার তথা বড় ইফতার। কারণ দীর্ঘ এক মাস আল্লাহর হুকুম পালনার্থে রোযা রাখার পর, ঈদের দিন থেকে আল্লাহ রোযা না রাখার এবং ঈদের খুশি উদযাপন করার অনুমতি প্রদান করেছেন। এই খুশি আখেরাতে আল্লাহর দিদার লাভের খুশিরই সামান্য নমুনামাত্র।

ইসলামী উৎসব অন্যসব ধর্মীয় উৎসব থেকে ভিন্ন

এটিও ইসলামের ভিন্ন একটি স্বাতন্ত্র যে, ইসলাম ধর্মে বছরে দুটিমাত্র উৎসব। যেখানে অন্যান্য ধর্মে বছরে অনেকগুলো উৎসব পালন করা হয়। একমাত্র ইসলামেই দুটি উৎসব। তা পালন করার জন্য যেই দিন ধার্য করা হয়েছে, তাও অন্য সব ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র। অন্য ধর্মের উৎসবের দিনগুলো লক্ষ করলে দেখবেন, অতীতের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা ও ঘটনার স্মৃতিচারণকে কেন্দ্র করে ধার্য করা হয়েছে। যেমন খৃস্টানরা ২৫শে ডিসেম্বর বড় দিনের উৎসব পালন করে। তাদের ধারণায় এটি হযরত ঈসা আ.-এর জন্মদিন। যদিও ঐতিহাসিকভাবে তা সঠিক নয়। কিন্তু তারা একটা ধারণা করে এই দিনকে উৎসবের দিন বানিয়ে নিয়েছে।

এমনিভাবে যেদিন হযরত মূসা আ. ও বনী ইসরাঈল ফেরাউনের জুলুম অত্যাচার থেকে মুক্তি পেল এবং ফেরাউনকে আল্লাহ পানিতে ডুবিয়ে মারলেন, তা স্মরণ করে সেই তারিখে ইহুদীরা উৎসব পালন করে। হিন্দুদের উৎসবগুলোও তাদের ধারণামতে অতীতের কোনো না কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকেন্দ্রিক।

ইসলামী উৎসব অতীতের কোনো ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়

পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্ম ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আযহার যে দুটি উৎসব দান করেছে, তার কোনোটিই অতীতের কোনো ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। ঈদুল ফিত্রের উৎসব হয় ১লা শাওয়াল এবং ঈদুল আযহার উৎসব হয় ১০ই যিলহজ্ব। কোনো দিনই বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটেনি। ইসলাম না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিনকে ঈদের দিন বানিয়েছে; না তাঁর হিজরতের দিনকে; না বদর উহুদ কিংবা আহযাবের দিনকে বানিয়েছে। ইসলাম মক্কা বিজয়ের দিনকেও ঈদ ও উৎসবের দিন ধার্য করেনি, যেদিন সর্বপ্রথম মক্কার আকাশে বাইতুল্লাহর ছাদে হযরত বেলালে হাবশী রাযি.-এর আযানের ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়েছিল। অথচ ইসলামের পুরো ইতিহাস; বিশেষ করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতে তাইয়েবার প্রতিটি অধ্যায়, এমন অসংখ্য ঘটনায় ভরপুর, যেগুলোকে কেন্দ্র করে ঈদ উদযাপন খুব সঙ্গত ছিল। কিন্তু তার কোনো ঘটনাকেই ইসলাম ঈদ বা উৎসবের দিন হিসাবে ধার্য করেনি।

ঈদুল ফিত্র হচ্ছে রোযা পূর্ণ করার পুরস্কার

যেই দিনগুলোকে ইসলাম উৎসবের জন্য ধার্য করেছে, তা এমন কোনো ঘটনার দিন নয়, যা অতীতে একবার ঘটেছে এবং একবার ঘটেই তা শেষ হয়ে গেছে। বরং এমন খুশির ঘটনাকেই ইসলাম উৎসবের দিন ধার্য করেছে, যা প্রতি বছরই ঘটে এবং এই ঘটনার খুশিকে কেন্দ্র করে মুসলমানরা ঈদ-উৎসব পালন করে। দুটি ঈদের দিনই আল্লাহ এমন সময় নির্ধারিত করেছেন, যখন মুসলমানরা বড় বড় দুটি ইবাদত থেকে ফারেগ হয়। ঈদুল ফিত্র রেখেছেন রমাযানের পর। যখন আল্লাহর বান্দারা পুরো রমযান মাস রোযা রাখে। আল্লাহর জন্য পানাহার বর্জন করে অনেক কষ্ট করে ইবাদত বন্দেগী করে। সুতরাং এভাবে ইবাদত বন্দেগী করার পুরস্কার হিসাবে রমযানশেষে উৎসবের দিন ধার্য করা হয়েছে।

ঈদের দিন পুরস্কারের দিন

খোলাসা কথা হল, ঈদুল ফিত্র হচ্ছে খুশি ও আনন্দের প্রথম ইসলামী উৎসব। হাদীসে এই দিনকে 'ইয়াওমুল জাওয়াইয' তথা পুরস্কার-দিবস বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরো মাসের ইবাদতের পুরস্কার দেয়ার দিন। পুরস্কার হিসাবে বান্দাকে মাগফিরাত ও ক্ষমা দান করা হয়। এক হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন রমযানশেষে যখন ঈদের দিন আসে, আল্লাহ ঈমানদারদের নিয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে গর্ব করেন।

আজ আমি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিব

মোটকথা, ঈদুল ফিত্রে যখন মুসলমানরা ঈদগাহে একত্র হয়, আল্লাহ তখন মানবসৃষ্টিতে আপত্তিকারী সেই ফেরেশতাদেরকে গর্ব করে বলেন হে ফেরেশতারা! ঐ দেখ আমার বান্দাদের, যারা এতদিন আমার ইবাদতে রত ছিল। বল যেই শ্রমিক তার কাজ পূর্ণ করে, তাকে কেমন প্রতিদান দেয়া চাই? উত্তরে ফেরেশতারা বলে, যেই শ্রমিক তার কাজ পূর্ণ করে দিয়েছে, তার ন্যায্য প্রতিদান হল, পরিপূর্ণ পারিশ্রমিক দিয়ে দেয়া; কোনো কমতি না করা। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন, এরা আমার বান্দা। রমযানে আমি তাদেরকে একটি দায়িত্ব দিয়েছিলাম। পানাহার ও স্ত্রী-সঙ্গম বর্জন করবে এবং আমার জন্য রোযা রাখবে। তারা তাদের দায়িত্ব আদায় করেছে এবং তারা আজ আমার কাছে বিভিন্ন আশা আকাঙ্খা নিয়ে ময়দানে একত্র হয়েছে; দু 'আ করছে। আমার ইজ্জতের কসম; আমার আজমত ও বড়ত্বের কসম, আজ আমি তাদের সবার দু 'আ কবুল করব। তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিব। এমনকি তাদের বদ আমলগুলো পর্যন্ত নেক আমল দিয়ে পরিবর্তন করে দিব। হাদীসে এসেছে, রোযাদার যখন ঈদগাহ থেকে ফিরে আসে, ক্ষমাপ্রাপ্ত মাসুম ও বে-গোনাহ হয়ে ফিরে আসে।

নামায যেন ঈদাগাহে পড়া হয়

ঈদগাহের পুরো উপস্থিতিকে ক্ষমা করে দেয়া কোনো মামুলি বিষয় নয়। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহের খোলা ময়দানে উপস্থিত হয়ে বড় জামা 'আতে ঈদের নামায আদায় করাকে সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন। কারণ জামা 'আত বড় হলে, ক্ষমা ও রহমতের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কে জানে, আল্লাহর কোন্ খাস বান্দার উসিলায় পুরো জামা 'আতের উপর তাঁর রহমত ও বরকতের বারি বর্ষিত হবে? সঠিক অর্থে তো আল্লাহর রহমতের হকদার হাতেগোনা কয়েকজনই হয়, যারা সঠিক অর্থে হক আদায় করে তাঁর

ইবাদত করার চেষ্ট করেন। কিন্তু আল্লাহর শানে-রহমত তো হল, তাদের প্রতি যখন দয়া ও মেহেরবানী করেন, তখন তাদের মাঝে থাকা আমার মতো নালায়েকদেরকেও দিয়ে দেন। তিনি ভাবেন, কিছু লোককে ক্ষমা করব; আর কিছু লোককে বাদ দিব, এতো আমার শানে-রহমতের খেলাফ। ফলে সবাইকে রহমত ও বরকত দিয়ে ভরপুর করে দেন।

রোযা ও ঈদ

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

১. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন, আদম সন্তানের সব আমল তার জন্যে, রোযা ছাড়া, তা আমার জন্যে, আমি তার প্রতিদান দিবো। রোযা (আযাব থেকে বাঁচার জন্যে) ঢাল। তাই যেদিন তোমাদের কেউ রোযা রাখে, তার উচিত কোনো অশ্লীল কাজ না করা এবং হৈচৈ না করা। কোনো ব্যক্তি যদি তাকে ভালো-মন্দ বলে বা ঝগড়া করে, তাহলে তাকে বলে দেওয়া উচিত; আমি রোযাদার। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম। রোযাদারের দু’ টি আনন্দ রয়েছে, একটি ইফতারের সময় ইফতার করার কারণে হয়। আরেকটি যখন সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হবে, তখন সে তার রোযার কারণে আনন্দ লাভ করবে।

(২) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ.

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন মানুষের জন্যে সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি তাকে খাওয়া থেকে এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পুরা করা থেকে বাধা দিয়েছি। তাই তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন এবং কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলা ঘুমানো থেকে বাধা দিয়েছি, এজন্যে তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। সুতরাং তাদের উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ.

৩. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

সব জিনিসের যাকাত রয়েছে। শরীরের যাকাত হলো রোযা।

(৪) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْتُ : آمِيْنَ.

৪. হযরত মালেক ইবনুল হুয়াইরিস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

আমার নিকট জিবরাইল এলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি রমাযান পেলো তারপরও সে নিজের গোনাহ ক্ষমা করাতে পারলো না, আল্লাহ তাকে নিজ রহমত থেকে দূর করে দিন। আমি বললাম, আমীন।

(৫) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، جَعَلَ اللهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً ، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا ، مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ ، وَمَنْ أَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ أَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ ، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيْ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ ، مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوْبِهِ ، وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُّنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُعْطِي اللهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِّنْ مَّاءٍ ، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْضِيْ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ ، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهِ فِيْهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، فَاسْتَكْثَرُوْا فِيْهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ ، خَصْلَتَانِ تَرْضَوْنَ بِهَا رَبَّكُمْ ، وَخَصْلَتَانِ لَا غِنًى لَكُمْ عَنْهُمَا ، فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تَرْضَوْنَ بِهَا رَبَّكُمْ : فَشَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَتَسْتَغْفِرُوْنَهُ ، وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنًى لَكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُوْنَ اللهَ الْجَنَّةَ ، وَتَعُوْذُوْنَ بِهِ مِنَ النَّارِ.

৫. হযরত সালমান ফারসি রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা ‘বান মাসের শেষ দিন আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিয়ে ইরশাদ করেন,

হে লোক সকল! তোমাদের উপর এমন একটি মাস ছায়াপাত করছে, যা মর্যাদাম-িত ও বরকতময়। এটি এমন একটি মাস, যার একটি রাত (শবে কদর) এক হাজার মাস থেকেও অনেক উত্তম। আল্লাহ তা ‘আলা এ মাসের রোযা তোমাদের উপর ফরয করেছেন এবং রাতের বেলা দাঁড়িয়ে ইবাদত করাকে নফল সাব্যস্ত করেছেন। কোনো ব্যক্তি যদি এ মাসে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্যে কোনো নেক কাজ করে, তাহলে সে এ পরিমাণ সওয়াব পায়, যে পরিমাণ অন্য মাসে ফরয আদায় করলে পায়। যে ব্যক্তি এতে ফরয আদায় করে, সে এ পরিমাণ সওয়াব পায়, যে পরিমাণ অন্য সময় সত্তরটা ফরয আদায় করলে পায়। এটি সবরের মাস, আর সবরের প্রতিদান জান্নাত। এটি (পরস্পরে) সহমর্মিতা ও সমবেদনার মাস। এটি এমন একটি মাস, যাতে মুমিনের রিযিক বৃদ্ধি করা হয়। যে ব্যক্তি এ মাসে কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে, তার এই আমল তার গোনাহের মাগফেরাত এবং আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে এবং সেও ঐ পরিমাণ সওয়াব পাবে, যে পরিমাণ সওয়াব ঐ রোযাদার পেয়ে থাকে, যাকে সে ইফতার করিয়েছে। একারণে রোযাদারের সওয়াবের মধ্যে কোনো কমতি হবে না। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রত্যেকের নিকট এ পরিমাণ সম্পদ নেই যে, সে কোনো রোযাদারকে ইফতার করাতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা ‘আলা এ সওয়াব ঐ ব্যক্তিকেও দান করবেন, যে একটি খেজুর, এক ঢোক পানি, বা পানি মিশ্রিত দুধ দ্বারাও কাউকে ইফতার করাবে।

এটি এমন একটি মাস যে, এর প্রথম অংশ রহমত, মাঝের অংশ মাগফিরাত এবং শেষাংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তি। যে ব্যক্তি এ মাসে তার ক্রীতদাসের কাজ হালকা করে দিবে, আল্লাহ তা ‘আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন। তাই তোমরা এ মাসে চারটি কাজ অধিক পরিমাণে করো। দু’ টি কাজ এমন, যা দ্বারা তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভ করবে, আর দু’ টি কাজ এমন, যা থেকে তোমরা অমুখাপেক্ষী হতে পারো না। যেই দুই কাজ দ্বারা তোমাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভ করবে, তার একটি হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দিতে থাকবে, আর দ্বিতীয়টি হলো, ইস্তিগফার করতে থাকবে। আর সেই কাজ, যা থেকে তোমরা অমুখাপেক্ষী হতে পারো না, তার একটি হলো, আল্লাহর নিকট জান্নাত চাইতে থাকবে, আর দ্বিতীয় হলো, জাহান্নামের আগুন থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে থাকবে। যে

ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে পরিতৃপ্ত করবে, আল্লাহ তা ‘আলা তাকে আমার হাউজে (কাউছার) থেকে এমন পানীয় পান করাবেন যে, জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার আর পিপাসা লাগবে না।

(৬) عَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، وَلَا يُرْفَعُ اِلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ.

৬. হযরত জারীর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

রমাযান মাসের রোযা আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলন্ত থাকে; শুধু সদকায়ে ফিতরার মাধ্যমে তা উপরে উঠানো হয় (অর্থাৎ, সদকায়ে ফিতরা আদায় করা ছাড়া রোযা কবুল হয় না।)

(৭) عَنْ سَعْدِ بن أَوْسٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَقَفَتِ الْمَلائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الطُّرُقِ ، فَنَادَوْا : أُغْدُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَبٍّ كَرِيمٍ يَمُنُّ بِالْخَيْرِ ، ثُمَّ يُثِيبُ عَلَيْهِ الْجَزِيلَ ، لَقَدْ أُمِرْتُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَقُمْتُمْ ، وَأُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ ، وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ ، فَاقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ ، فَإِذَا صَلَّوْا ، نَادَى مُنَادٍ : أَلا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ ، فَارْجِعُوا رَاشِدِينَ إِلَى رِحَالِكُمْ ، فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ ، وَيُسَمَّى ذٰلِكَ الْيَوْمُ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ.

৭. হযরত সা ‘দ ইবনে আউস রাযি. স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

যখন ঈদুল ফিতরের দিন আসে, তখন ফেরেশতারা রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে যায় এবং আওয়াজ দিতে থাকে, হে মুসলমানগণ! এমন এক প্রতিপালকের দিকে চলো, যিনি ভালো কাজের তাওফীক দিয়ে দয়া করেন, তারপর এর জন্যে অনেক সওয়াবও দিয়ে থাকেন। তোমাদেরকে রাতে (তারাবীহতে) দাঁড়িয়ে থাকার হুকুম দেওয়া হয়েছিলো। তোমরা দাঁড়িয়ে থেকেছো, তোমাদেরকে দিনে রোযা রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছিলো, তোমরা রোযা রেখেছো এবং তোমাদের প্রতিপালকের আনুগত্য করেছো, এখন নিজেদের পুরস্কার গ্রহণ করো। সুতরাং যখন লোকেরা নামায শেষ করে, তখন এক ঘোষক ঘোষণা করে, শোনো! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এখন হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাও। মূলত ঈদের দিন পুরস্কারের দিন। আসমানে এদিনের নামও ‘ইয়াওমুল জায়েযা’ (পুরস্কারের দিন)।

ইফতার তাড়াতাড়ি কেন?

ইফতার সম্পর্কে হুকুম দেওয়া হয়েছে তাড়াতাড়ি কর। অকারণে দেরিতে ইফতার করা মাকরূহ। কেন? কারণ এই যে, এতক্ষণ পানাহার থেকে বিরত থঅকা সওয়অবের কাজ ছিল, অনেক বড় ফযীলতের কাজ ছিল, কেননা তখন আল্লাহ তা’ আলার হুকুম ছিল পানাহার থেকে বিরত থাকা। কিন্তু তিনি যখনর বলে দিলেন, এখন পানাহার কর, তখন দেরি করা গুনাহের কাজ। কেননা এখন দেরি করলে রোযাকে নিজের পক্ষ থেকে দীর্ঘায়িত করা হবে। আর আল্লাহ তা’ আলা তো সে হুকুম করেননি।

সাহরীতে দেরি করার কারণ

সাহরীতে দেরি করা উত্তম। আগে আগে সাহ্রী খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তা সুন্নতের খেলাফ হয়। বরং যখন সাহরীতে সময় শেষ হয়ে যায়, ঠিক তার আগ মুহূর্তেই সাহরীতে খাওয়া চাই। এটাই উত্তম। কেননা কেউ আগে সাহরীতে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে সে নিজের পক্ষ থেকে রোযার পরিমাণ দীর্ঘ করে ফেলল। সে এটা শরীআতের অনুসরণে করেনি, নিজের পক্ষ থেকে করেছে। সারকথা সব কাজে শরীআতের অনুসরণ জরুরী।

আমরা আল্লাহ তা’ আলার বান্দা। বান্দা ও গোলাম বলেই তাকে, যে মনিব যখন যা বলে তাই করে। নিজ মরজিতে কিছু করে না।

ইফতার কেন সময় হওয়া মাত্রই করতে হয়?

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা’ আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজাকে যেই স্তরে করার হুকুম দিয়েছেন, সে কাজকে সেই স্তরে রেখে অনুসরণ করারই নাম দ্বীন। সেই স্তর থেকে উপরে উঠালে বা নিচে নামলে সেটা দ্বীন হয় না। কিংবা বলুন, প্রত্যেক কাজের একটা সীমারেখা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। কাজটিকে সেই সীমারেখা মেনে করলে তবেই তা দ্বীন হয়। তা না করে যদি সীমারেখা লঙ্ঘন করা হয়,অর্থাৎ কোন কাজকে যদি তার নির্দিষ্ট সীমার আগেই শেষ করে দেওয়া হয় বা সীমারেখায় ক্ষান্ত না হয়ে আরও পরে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে তা দ্বীন হবে না; বরং দ্বীন মনে করে তা অবলম্বন করলে বিদ ‘আত হয়ে যাবে।

রমাযানের রোযাকেই ধরুন। আমরা শেষ রাতে সাহরীতে খাই। সারা দিন ক্ষুধার্ত থাকি। তারপর যখন সূর্যাস্ত হয় ইফতার করি শরীআতের নির্দেশ হল সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে-সাথে ইফতার কর, দেরি করো না। প্রশ্ন হচ্ছে ইফতার কেন তাড়াতাড়ি করতে হবে? দিনভর আল্লাহ তা’ আলার জন্য পানাহার বর্জনের পর যদি আরও এক ঘন্টা বেশি পানাহার বর্জিত থাকা হয়, তাতে দোষ কী? এমনটা করলে তাতে এমন কি ক্ষতি হবে? আপাত দৃষ্টিতে এতে কোন দোষ বা ক্ষতি নজরে আসে না। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন, সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্র শীঘ্র ইফতার করে নাও, কিছু পানাহার করে নাও।

কেননা আল্লাহ তা’ আলার হুকুম ছিল সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাক সূর্যাস্ত হল রোযার শেষ সীমা। সূর্য যখন অস্ত হয়ে গেছে, তখন রোযা তার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। এরপর আর রোযা নেই। তুমি যদি রোযাকে এ সীমার পরেও নিয়ে যাও এবং এক ঘন্টা পর ইফতার করতে মনস্থ কর, তবে তার অর্থ হবে আল্লাহ তা’ আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযার যে সীমানা নির্ধারণ করেছেন তোমরা সে সীমানা ঠেলে আরও সরিয়ে দিলে এবং রোযার সময় আরও বাড়িয়ে নিলে। এটা শরীআতের অনুসরণ হল না। আল্লাহর আনুগত্য হল না। আনুগত্য হবে তখনই, যখন বলা হবে খেও না, তখন খাবে না। সেই না খাওয়াও হবে ইবাদত। আবার যখন বলা হবে খাও, সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেবে, এই খাওয়াও হবে ইবাদত। পক্ষান্তরে তখন যদি না খাও, তবে সেটা হবে অবাধ্যতা, ইবাদত নয়। তখন গুনাহগার হবে।

ঈদের দিন রোযা রাখলে গুনাহ হয় কেন?

এমনিভাবে রমাযানের পূর্ণ মাস রোযা রাখা হল। রোযা রাখার ফযীলত অনেক। এক হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রাখে আল্লাহ তা’ আলা তার আগে-পিছের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন।

অন্য হাদীছে আছে, রোযা রাখার কারণে মুখে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় আল্লাহ তা ‘আলার কাছে তা মিশকের চেয়েও বেশি প্রিয়।

আল্লাহ তা’ আলা এ রোযা মোযান মাসেই ফরয করেছেন। ঈদের দিন আসলে তার সীমা শেষ হয়ে যায়। এ দিন রোযা না রাখাই আল্লাহ তা’ আলার হুকুম। কাজেই কেউ যদি এ দিন রোযা রাখে তবে যে রোযা এত ফযীলত ও সওয়াবের কাজ ছিল, সেটাই উল্টো গুনাহে পরিণত হবে ও আযাবের কারণ হয়ে যাবে, অথচ

আপাতদৃষ্টিতে সে কোন পাপকার্য করেনি। সে তো রোযাই রেখেছে, যা একটি ইবাদত ও সওয়াবের কাজ। এখানেও কথা সেটাই যে, এটা ইবাদত ততক্ষণই, যতক্ষণ শরী 'আতের সীমারেখার ভেতর করা হবে এবং আল্লাহ তা' আলার হুকুম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক করা হবে। সে তা করেনি। কাজেই তার কাজ ইবাদতরূপে গণ্য হবে না; তা গুনাহের কাজ হয়েছে এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়েছে।

সুতরাং দ্বীন হচ্ছে শরী 'আতের অনুসরণ করার নাম। কেউ নতুন কোন পন্থা ও নিয়ম উদ্ভাবন করে তার নাম যদি ইবাদত রেখে দেয়, তাকে দ্বীনের অংশ বানিয়ে ফেলে ও সুন্নত হিসেবে তা প্রচার করে এবং কেউ তা গ্রহণ না করলে তাকে গালমন্দ করে আর বলে সে একজন বেদ্বীন, তবেতার উদ্ভাবিত নিয়মটি বিদ 'আত হয়ে যাবে এবং বিদ 'আত হওয়ার কারণে তা সওয়াবের নয়; বরং গুনাহের কাজ হয়ে যাবে। কেননা দ্বীনের মদ্যে নিজের তেকে একটা কাজ যোগ করে দিয়েছে আর এভাবে আল্লাহ তা 'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, অথচ কুরআন মাজীদের স্পষ্ট নির্দেশ।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝١

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে চলে যাওয়ার চেষ্টা করো না। আল্লাহকে ভয় কর নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

কাজেই আল্লাহ তা 'আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সীমারেখা স্থির করে দিয়েছেন সেই সীমারেখার মধ্যেই থাক। তা ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করোনা। ডিঙিয়ে গেলে বিদ 'আতে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে অপরাধী ও শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হবে।

ঈদের দিনের কোলাকুলি

সারা দেশে দস্তুর হয়ে গেছে ঈদের দিন ঈদের নামায আদায়ের পর একে অন্যের সাথে কোলাকুলি করতে হয়। এমনিতে মু 'আনাকা করাটা কোন গুনাহের কাজ নয়। বরং জায়েয। কিন্তু এই গলাগলি করাটা তো সুন্নত কেবল প্রথম সাক্ষাতকালে। কোন ব্যক্তি সফর থেকে এসেছে এবং তার সাথে এই প্রথম সাক্ষাত হচ্ছে, এরূপ ক্ষেত্রে তার সাথে মু 'আনাকা ও গলাগলি করা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। সাধারণ অবস্থায় মুআনাকা করা যেমন সুন্নত নয় তেমনি গুনাহও নয়। কোনো এক মুসলিম ভাই আপনার ঙ্গে সাক্ষাত করতে আসল। আপনার ইচ্ছা হল তার সাথে মু 'আনাকা ও গলাগলি করা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত বা দ্বীনে লংশ আর কেউ এটা না করলে তার ঈদই পূর্ণ হয় না বা তার দ্বীন ত্রুটিপূর্ণ হয় ও সে গুনাহগার হয়ে যায়, তবে এটা ভুল। এরকম ধারনা নিয়ে ঈদের দিন গলাগলি করা জায়েয নয়। করলে তা বিদ 'আত হয়ে যাবে। এরকম ধ্যান-ধারনা ছাড়া কেবল নিজ মনর আনন্দ প্রকাশের জন্য গলাগলি করলে ঠিক আছে। সেটা দোষের নয়। কিন্তু এটাকে সুন্নত মনে করা ও দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করার কারণেই এ কাজ বিদ 'আতে পরিণত হয়ে যায়।

এ বছর আমিও ইতিকাফ করবো না

কিন্তু সমস্যা ছিলো এই যে, তিনি যেহেতু আয়েশা (রা.) -কে ইতিকাফের অনুমতি দিয়েছিলেন- যদিও তাঁকে অনুমতি দেওয়াটা সঙ্গত কারণেই ছিলো, যা অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো না- তথাপিও রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা করলেন, যদি আমি আয়েশার তাঁবু রেখে অন্যদেরকে নিষেধ করি, তাহলে এটা তাদের জন্যে কষ্টকর হতে পারে। এ জন্যে অন্যদের তাঁবু উঠানোর সঙ্গে সঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) -কেও বললেন, তোমার তাঁবুও উঠিয়ে নাও। কিন্তু যখন ভাবলেন আয়েশাকে তো সুস্পষ্ট অনুমতি দিয়েছিলাম, এখন তাঁবু উঠিয়ে দেওয়া তাঁর জন্যে কষ্টের কারণ হতে পারে, এ জন্যে তাঁর প্রতি খেয়াল করে ঘোষণা দিলেন যে, আমিও এ বছর ইতিকাফ করবো না। এ কারণে তিনি ঐ বছর আর ইতিকাফই করলেন না।

ইতিকাফের ক্ষতিপূরণ

অবশেষে যখন অন্য উম্মুল মুমিনীনদের প্রতি খেয়াল করে হযরত আয়েশা (রা.) এর তাঁবু উঠিয়ে দিলেন এবং আয়েশা (রা.) এর প্রতি খেয়াল করে নিজেও ইতিকাফ করলেন না। যে ইতিকাফের আমল তিনি আজীবন করেছেন, অন্যের মনে কষ্টের আশঙ্কায় সে ইতিকাফ এবার ছেড়ে দিলেন। ফলে এর ক্ষতিপূরণের জন্যে পরবর্তী বছরের রমাযানে দশ দিনের পরিবর্তে তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেন।

রমাযানের সমূহ বরকত অর্জনের উপায়

একবার হযরত বলেন, কেউ যদি রমাযান মাসে অসুস্থ হয় কিংবা সফরে বের হয় এবং এ কারণে রোযা রাখতে না পারে। তাহলে তার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হলো, সে এ রোযাগুলো পরে কাযা করে নিবে এবং সে যেহেতু শরীয়তসম্মত ওযরের কারণে রোযা ভেঙ্গেছে, এ জন্যে পরবর্তীতে যে দিনগুলোতে সে ঐ রোযা কাযা করবে, তাতেই তার রমাযান মাস ফিরে আসবে। অর্থাৎ রমাযান মাসে যেমন বরকত-রহমত ছিলো, এখন এ দিনগুলোই তার জন্যে সে রকম রহমত বরকতপূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ, শরীয়তসম্মত ওযরবশত রমাযানের রোযা ভাঙ্গার কারণে সে রমাযানের বরকত থেকে মাহরুম থাকবে, এটা আল্লাহর রহমতের সঙ্গে কিছুতেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

সুতরাং কেউ শরীয়তসম্মত ওযরের কারণে তার কোনো নফল আমল ছেড়ে দিলে বা বিলম্বিত করলে সেখানেও ইনশাআল্লাহ ঐ আমলের সব নূর ও বরকতের অধিকারী হবে। কারণ, সময়ের দাবি পূরণ করাই দ্বীন। আপনি এরূপ বলবেন না যে, এখন আমার যিকিরের সময় বা তিলাওয়াতের সময়, অতএব কেউ অসুস্থ হোক বা মারা যাক তাতে আমার কি? এমন মনোভাব পোষণ করা কখনো দ্বীন হতে পারে না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা

এমনিভাবে অন্যদেরকে সারা বছরে শুধুমাত্র রমাযানের এক মাস রোযা রাখার হুকুম দিয়েছেন, কিন্তু তিনি নিজে বছরের প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিন রোযা রাখতেন। কতক সময় তিন দিনের অধিকও রাখতেন। অন্যদেরকে তো হুকুম দিচ্ছেন যে, ইফতারের সময় হলে অবিলম্বে ইফতার করবে। দুই রোযা একত্র করাকে নাজায়েয সাব্যস্ত করেছেন। এভাবে রোযা রাখাকে 'সওমে বেসাল' বলা হয়।

কাযা রোযায় স্বামীর দিকে লক্ষ রাখা

তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে আছে, হযরত 'আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা 'আলা আনহা বলেন, রমযান মাসে প্রাকৃতিক কারণে আমার যে সব রোযা ছুটে যেত সাধারণত তার কাযা পূরণে আমার শা 'বান মাস পর্যন্ত দেরি হয়ে যেত। অর্থাৎ এগার মাস পর তা রাখা হত। শা 'বান পর্যন্ত দেরি করতাম এ কারণে যে, এ মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব বেশি রোযা রাখতেন। কাজেই এ সময় রোযা রাখলে আমার কাযা রোযাগুলি তাঁর রোযা অবস্থায় পূর্ণ হয়ে যেত, আর এটাই ওই অবস্থা অপেক্ষা শ্রেয় যে, আমি রোযা রাখলাম, অথচ তিনি রোযাদার নন। চিন্তা করুন, তাঁর এ রোযা নফল রোযা ছিল না; বরং রমযানের কাযা রোযা। কাযা রোযার ব্যাপারে নিয়ম হল, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব তা রেখে ফেলা চাই। অথচ হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা কেবল এই ভেবে শা 'বান পর্যন্ত দেরি করতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কষ্ট হতে পারে।

(বুখারী, হাদীছ নং ১৮১৪; মুসলিম, হাদীছ নং ১৯৩৩)

রোযার ফযীলত

তারা রোযার ফযীলত সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি সব ইবাদতের প্রতিদান নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। অমুক ইবাদতের ছওয়াব দশগুণ, অমুক ইবাদতের ছওয়াব শতগুণ, অমুক ইবাদাতের সাতশ গুণ ইত্যাদি। কিন্তু রোযা ব্যতিক্রম। এ সম্পর্কে তার ঘোষণা,

• اَلصَّوْمُ لِیْ وَ اَنَا اَجْزِیْ بِه

রোযা আমারই জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দেব।

(বুখারী, হাদীছ নং ৬৯৩৮; মুসলিম হাদীছ নং ১৯৪৬; তিরমিযী হাদীছ নং ৬৯৫; নাসাঈ হাদীছ নং ২১৮১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৪০৩৬)

অর্থাৎ রোযার যে প্রতিদান আমি দেব, তোমাদের পরিমাপ ও তোমাদের হিসাব-নিকাশ দ্বারা তার কোন কিনারা পাবে না। রোযা যেহেতু কেবল আমারই জন্যে তাই এর প্রতিদানও আমি আমার শান মোতাবেক দেব। সাহাবায়ে কিরাম রোযার এ ফযীলত শুনেছিলেন। তাই এর চেয়ে বেশি ফযীলতের জিনিস কী হতে পারে তা তাদের ভাবনায় ছিল না।

এ রোযা কার জন্য রাখছিলে?

আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব (কু.সি.) হযরত থানভী রহ.-এর এ কথা বর্ণনা করতেন যে, এক ব্যক্তি রমাযান মাসে অসুস্থ হয়। অসুস্থতার কারণে তার রোযা ছুটে যায়। রমাযানের রোযা ছুটে যাওয়ার কারণে সে ব্যথিত ছিলো। হযরত বললেন, দুঃখ করার কোনো কারণ নেই। তুমি এটা দেখো যে, রোযা কার জন্য রাখছিলে? তুমি যদি নিজের জন্য, নিজের মনকে খুশি করার জন্য, নিজের আগ্রহ পুরা করার জন্য রোযা রাখছিলে তাহলে তো নিঃসন্দেহে দুঃখিত হও যে, অসুস্থতার কারণে রোযা ছুটে গেলো। কিন্তু যদি আল্লাহ জন্য রোযা রাখছো তাহলে ব্যথিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, আল্লাহ তা 'আলা নিজে বলেছেন যে, অসুস্থ অবস্থায় রোযা ছেড়ে দাও।

তাই শরীয়তসম্মত ওযরের কারণে যদি রোযা কাযা হয় বা আমল ছুটে যায় যেমন অসুস্থতা, সফর, মেয়েদের স্বাভাবিক সমস্যা বা অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যস্ততার কারণে– যা দ্বীনেরই দাবি ছিলো– আমল ছুটে যায়, উদাহরণস্বরূপ, মা-বাবা অসুস্থ তাদের খেদমতে ব্যস্ত থাকার ফলে আমল ছুটে গেলো, তাহলে এর জন্য মোটেই ব্যথিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু অলসতার কারণে আমল ছাড়া উচিত নয়।

রোযা অবস্থায় আল্লাহর ভয়

আল্লাহর এই ভয়ের অভিজ্ঞতা দেখুন, এযুগেও মানুষ যতো বড়ো ফাসেক হোক, ফাজের হোক, গোনাহগার হোক যদি রমাযান মাসে রোযা রাখে, প্রচন্ড গরম পড়ছে, তীব্র পিপাসা লাগছে, জিহ্বা বের হয়ে আসছে, বদ্ধ কক্ষ, নির্জন কক্ষ, পাশে অন্য কোনো মানুষ নেই, কক্ষের মধ্যে ফ্রিজ রয়েছে, ফ্রিজে ঠাণ্ডা পানি রাখা আছে। তখন এই প্রচন্ড পিপাসা অবস্থায় ঠান্ডা পানি পান করতে মানুষের মন চায়। কিন্তু বর্তমানে এই অধপতিত যুগেও কি কোনো মুসলিম এমন আছে, যে এ সময় ফ্রিজ থেকে পানি বের করে পান করবে? কখনোই সে পান করবে না। অথচ সে পানি পান করলে কোনো মানুষই জানতে পারবে না। কেউ তাকে তিরষ্কার করবে না। দুনিয়াবাসীদের সামনে সে রোযাদার বলেই পরিগণিত হবে। সন্ধ্যায় বাইরে বের হয়ে মানুষের সাথে ইফতারি খেলে কেউ জানতেও পারবে না যে, সে রোযা ভেঙ্গেছে। এতদসত্ত্বেও সে পানি পান করবে না।

এবার বলুন, সেটি কোন জিনিস যা তাকে বন্ধ কক্ষেি পানি পান করতে বাধা দিলো। আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কিছু নয়। যেহেতু আমাদের রোযা রাখার অভ্যাস হয়ে গেছে এ জন্য এ অভ্যাসের পরিণতিতে সেই ভয় কার্যকর হয়েছে।

রমযান পেয়েও মাগফিরাত পেল না

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন, জিবরাঈল আ. দু 'আ করলেন, ঐ ব্যক্তির চেহারা ধূলাধূসরিত হোক, যে পুরো রমযান মাস অতিবাহিত করল, অথচ আল্লাহর নিকট থেকে তার গোনাহগুলো ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না। সুতরাং আমাদের আজকের দিনটি বড় ভয়ের দিন। আল্লাহ না করুন, আমরা আবার এই বদ-দোয়ার শিকার না হয়ে যাই। রমযান তো প্রায় শেষ হয়ে গেল। আমাদের মাগফিরাত হয়েছে কি না, কে জনে? রমযান মাস আল্লাহ দান করেছিলেন আমাদের গোনাহ ও অন্তরের ময়লা আবর্জনা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার জন্য। এ মাসে মাগফিরাত অর্জন করা কঠিন কোনো কাজ নয়। সারা রাত আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বান হতে থাকে, আছো কেউ ক্ষমাপ্রার্থী! যাকে আমি ক্ষমা করব? আছো কেউ রিযিকপ্রার্থী! যাকে আমি রিযিক দান করব? আছো কেউ বিপদগ্রস্ত! যাকে আমি বিপদ থেকে উদ্ধার করব? প্রতিদিন রাতভর এভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বান হতে থাকে। তারপরও যদি কেউ ক্ষমা না নিতে পারে, তাহলে তো বোঝা যায়, সে নিজেকে আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষীই মনে করে না। সে ধ্বংস হবে না তো কে ধ্বংস হবে?

ঈদের দিন গোনাহ

আমাদের অবস্থা তো হল যেই ঈদের দিন আসল, অমনি আমাদের গোনাহের সয়লাব শুরু হয়ে গেল। না আল্লাহর কথা স্মরণ থাকে; না রাসূলের কথা স্মরণ থাকে; না আল্লাহর সামনে জবাবদেহির কোনো ফিকির থাকে। ঈদের দিন আমাদের শুধু গোনাহ আর গোনাহ হতে থাকে। আল্লাহর নাফরমানির ্রাতে বয়ে যায়। যেই গানবাদ্য কাফেরদের উৎসবের মাধ্যম, সেগুলো দিয়ে আমরা ঈদের উৎসব পালন করি। নারীরা বেপর্দা হয়ে বের হয়ে পড়ে। সবাই যেন আল্লাহর এক একটি বিধান লঙ্ঘন করে আর ঈদের উৎসব পালন

করে। এ কেমন ঈদ?! তিনি তো ঈদে আমাদের ক্ষমা করতে চাচ্ছেন, আর আমরা জাহান্নামে যাওয়ার সকল বন্দোবস্তের উৎসব করছি! আল্লাহ আমাদের সকলকে এই পরিণাম থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

ঈদের খুশি কার অধিকার?

অতএব তোমরা যখন রোযা রেখেছ; তারাবী পড়েছ, এবার তোমরা ঈদুল ফিত্রের উৎসব পালন কর। তোমরা যখন হজ্ব আদায় করেছ, এবার ঈদুল আযহার উৎসব পালন কর।

আল্লাহ মুসলমানদেরকে ঈদ-উৎসবের যে পন্থা দিয়েছেন, তাও অন্যান্য জাতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ঈদের দিন ময়দানে চলে আস। অন্যান্য নামায মসজিদে আদায় করা উত্তম হলেও ঈদের দিন খোলা ময়দানে নামায আদায় করা উত্তম। কারণ আল্লাহ আজ বান্দাদের প্রতি ব্যাপক রহমত বর্ষণ করবেন। এজন্য খোলা ময়দানে ডেকে এনেছেন। ময়দানে আসার পূর্বে ফিত্রা আদায় করে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা গরীব; যাদের চুলা ঠা-া, তাদের যেন অন্তত আজকের দুশ্চিন্তা না থাকে যে, আমি আজ খাব কোত্থেকে? উৎসব মানানোর এই ব্যতিক্রম আয়োজন, আল্লাহ একমাত্র মুসলমানদের জন্যই করেছেন। কিন্তু আফসোস! আজ মুসলমান উৎসবের এত সুন্দর ও স্বতন্ত্র পথ পরিহার করে; কাফের মুশরিকদের রাস্তা অবলম্বন করেছে। তারা যেভাবে গানবাদ্য দিয়ে উৎসব করে, আমরাও আজ তা-ই করছি। উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনায় মত্ত হয়ে যেভাবে তারা উৎসবের সময়গুলো নষ্ট করে, আমরাও আজ তা-ই শুরু করেছি। এগুলো সম্পূর্ণ পরিহারযোগ্য। আল্লাহ মেহেরবানী করে আমাদের সকলকে সঠিক বিষয় বোঝার তাওফীক দিন; রমযানের যথাযথ বরকত নসিব করুন এবং সঠিকভাবে ঈদের উৎসব পালনের তাওফীক দান করুন। গোনাহ ও নাফরমানির কাজ থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

ঈদের দিন কোলাকুলি করা কখন বিদ 'আত

ঈদের নামাযের পর দু' জন মুসলমান ভাই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পরস্পরে কোলাকুলি করা মৌলিকভাবে নাজায়েয কাজ নয়। কিংবা উদাহরণস্বরূপ এখন আপনি এই মজলিস থেকে উঠে কারো সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। তাহলে এটা গোনাহের বিষয় নয়, বরং জায়েয। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি একথা চিন্তা করে যে, ঈদের নামাযের পর কোলাকুলি করা সুন্নাত, এটাও ঈদের নামাযের অংশ, কোলাকুলি না করলে ঈদ হলো না, তাহলে এই আমলই বিদ 'আত হয়ে যাবে। কারণ এমন একটি কাজকে সুন্নাত সাব্যস্ত করা হলো, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত সাব্যস্ত করেননি। সাহাবায়ে কেরামও এটাকে সুন্নাত সাব্যস্ত করেননি এবং এর পাবন্দি করেননি। এখন যদি কেউ কোলাকুলি করতে অস্বীকার করে আর আপনি তাকে বলেন আজ ঈদের দিন কেন কোলাকুলি করবে না? তার অর্থ এই দাঁড়ালো যে, আপনি ঈদের দিন কোলাকুলি করাকে জরুরী সাব্যস্ত করলেন। আর মনগড়াভাবে জরুরী সাব্যস্ত করাই এ কাজটিকে বিদ 'আত বানিয়ে দিলো। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে যদি কোলাকুলি করতে মন চায় এবং কোলাকুলি করে তাহলে এটা মৌলিকভাবে বিদ 'আত নয়। মোটকথা, কোনো জায়েয কাজকে জরুরী সাব্যস্ত করা বা সুন্নাত ও ওয়াজিব সাব্যস্ত করার দ্বারা তা বিদ 'আত হয়ে যায়।